চাঁদমামা

ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩

পেটের গোলমাল? সে আবার কি বাপু? কোনদিন শুনিনিতো!
ডাবর গ্রাইপ ওয়াটার
প্রত্যেক মায়ের কাছে তার শিশুর মতন প্রিয়
শিশুদের বদহজম, অম্বল, পেটব্যাথা, বায়ু ও দাঁতউঠার সময় ব্যাথার একটি সুস্বাদু সুনিশ্চিত সমাধান
GRIPE WATER
ডাবর (ডাঃ এস. কে. বর্ম্মন) প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

রসেভরা...মনেরমত...মজাদার
মাত্র
২৫
পয়সা!
PARLE
POPPINS
FRUITY SWEETS
নতুন পার্লে
পপিন্স
ফলের স্বাদেভরা লজেন্স
লেবু, জামীর, কমলালেবু, আনারস আর র‍্যাম্পবেরী—এই ৫টি ফলের স্বাদে ভরপুর কমদামের সুন্দর সুন্দর প্যাকে খুব সুস্বাদু ১৩ টি লজেন্স পাওয়া যাচ্ছে।
৫টি ফলের মজা পাবেন, পপিন্স যখনই খাবেন
everest/122d/PPi ben

চাঁদমামা

সংস্থাপক : বি. নাগি রেড্ডি

নিয়ন্ত্রণ : চক্রপাণি

এই বারের বেতাল কথায় 'রাক্ষস-বিবাহ' নামে এক কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। যুক্তি এবং সাহসের অপূর্ব এক সমন্বয় ঘটেছে এই কাহিনীতে।

এই সংখ্যায় 'এক দিনের রাজার' শেষ অংশ রয়েছে। পাঠক পাত্রেই এই শেষ পর্ব পড়ে আনন্দ পাবেন। আগামী সংখ্যা থেকে আরবের এক কাহিনী পরিবেশিত হবে।

'স্থান কাল পাত্র' কাহিনীতে আজকের পৃথিবীতে বাস্তব জ্ঞান না থাকলে যে ঠকতে হয় এই সত্য উপলব্ধি পাঠকের ঘটবে। এছাড়া আছে হারানো আংটি, কথার দাম, সোনার পাখি, হাতীর পঞ্চায়েত প্রভৃতি। চলছে: যক্ষপর্বত, মহাভারত ও শিবপুরাণ।

খণ্ড ১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ সংখ্যা ৮

হারানো আংটি

এক শবর রাজার কাছে ইল্ল ও মল্ল নামে দুজন চাকর ছিল। দুজনেই বিশ্বাসী পাত্র। কিন্তু রাজা ইল্লকে বেশি ভালবাসত।

একদিন রাজা দুজনকেই ডেকে পাঠিয়ে বলল, "তোমরা দুজনে ছুটি নিয়ে যে-যার বাড়ি ফিরে যাও। তিন দিন পরে এখানে একটা মেলা বসবে, সেই মেলা দেখতে অবশ্যই এস। নাও, তোমরা দুজনে এই পুরস্কার নাও।" একথা বলে রাজা ইল্লকে একটা ছোট পাথর এবং মল্লকে একটা কন্দ দিল।

রাজা ইল্লকে একটা পাথর দেওয়ায় ইল্ল মনে মনে ভীষণ চটে ছিল। সে বলল, "এই ফালতু পাথরটা বাড়ি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাওয়ার দরকারটা কি!"

"না না অমন কাজ করো না। আমি এই কন্দ বইতে পারছি না। নিজেদের জিনিস বদল করে নি।" মল্ল বলল।

দুজনে পুরস্কার অদল-বদল করে বাড়ি ফিরে গেল। ইল্ল কন্দ রান্না করিয়ে খেয়ে ফেলল। বাড়ির আঙিনায় মল্ল জ্যোৎস্না রাতে বসে সেই পাথরটা যাচাই করছিল। ঠিক সেই সময় সেই পাথরের এক কোন থেকে কি যেন চমকাচ্ছিল দেখতে পেল মল্ল। সে পাথরটাকে ভেঙ্গে দেখল। সেই পাথরের ভিতরে সযত্নে যেন একটা সোনার অলঙ্কার রাখা ছিল।

মল্ল বুঝতে পারল যে ইল্লর প্রতি রাজা পক্ষ পাতিত্য করেছে। রাজা গোপনে ইল্লকে এই সোনার অলঙ্কার দিতে চেয়েছে। যাই হোক, মল্ল সেই অলঙ্কার নিজের কাছে রেখে নিল।

তিন দিন পরে মেলা বসল। সেদিন রাজার বাড়িতেও অনেক লোক নিমন্ত্রণ খেতে বসল। সেই সময় মল্লের গায়ে সেই অলঙ্কার দেখে রাজা অবাক হল।

পদ্মা ভদ্র

রাজা জিজ্ঞেস করল, "মল্ল এই অলঙ্কার তুমি কোত্থেকে পেলে ?"

মল্ল রাজাকে সত্য কথাই বলে দিল। ইল্ল অদল-বদল করার অপরাধ স্বীকার করে রাজার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল। পাথরের ভিতরে অলঙ্কার ছিল বলে সে যে জানতো না তাও ইল্ল জানাল।

রাজা ইল্লকে ক্ষমা করল। কিন্তু মল্লকে বধ করার সিদ্ধান্ত করল রাজা। নিমন্ত্রণ রক্ষা করে সবাই যখন বিদায় নিয়ে ফিরছিল তখন রাজাকে মল্ল বলল, "আমি এই অলঙ্কারের কথা আপনাকে আগে জানাইনি তার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। যে পুরস্কার দিয়ে ছিলেন তা আমি বদলেছি। আমার ভুল হয়েছে। কন্দটাকে ইল্ল এবং তার স্ত্রী খেয়ে নিয়েছে।"

"আমি যে ক্ষমা করছি তার চিহ্ন স্বরূপ আমি তোমাকে একটা আংটি দিচ্ছি। তুমি এটাকে যত্নে রেখে আগামী সপ্তায় দেখাবে। এটা হারালে তোমার মৃত্যু দণ্ড হবে।" রাজা বলল।

মল্ল বুঝল যে রাজা তাকে ভাল চোখে দেখে না। মল্ল ভাবতে লাগল কি ভাবে এই মনোভাবের পরিবর্তর করানো যায়। সাত পাঁচ ভেবে সে আংটিটাকে কুটিরে লুকিয়ে রাখার মত জায়গা পেল না।

গভীর রাতে মল্ল উঠল। তার বউ ছেলে মেয়ে ঘুমোচ্ছে। আস্তে আস্তে উঠে দরজার কাছে একটা ফুটো করে তাতে

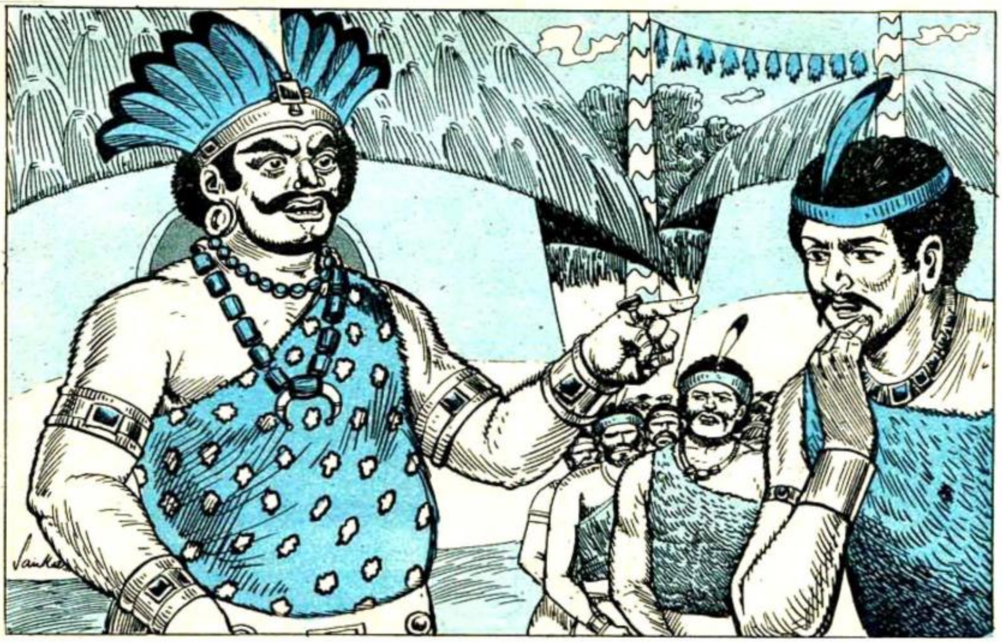

আংটি রেখে আবার কাদামাটি দিয়ে ঢেকে দিল সেই ফুটো। এমন ভাবে ঢেকে দিল যেন বোঝা না যায়।

সকালে উঠে দেখে চমৎকার দেওয়ালের সাথে ঐ ফুটো ঢাকা জায়গাটা মিশে গেছে। তখন মল্ল নিশ্চিন্ত হয়ে মনে মনে ভাবল আর আংটি হারানোর ভয় নেই। অতএব তার প্রাণেরও ভয় নেই।

এই ঘটনার দুদিন পরে রাজা মল্লের স্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়ে বলল, "তোমার স্বামী একটা আংটি কোথায় লুকিয়ে রেখেছে জান ? তুমি সেটা এনে দাও। পরিবর্তে আমি তোমাকে অনেক সোনা দেব। তবে একথা তুমি আগে-ভাগে তোমার কর্তাকে বল না। হঠাৎ অনেক সোনা দেখে তোমার কর্তা একেবারে অবাক হয়ে যাবে।

মল্লের বউ একথা কল্পনাই করতে পারেনি যে তার স্বামীকে বধ করার জন্যই রাজা এসব কথা বলছেন। এত সোনা দিতে চাইছেন ঐ আংটির পরিবর্তে। মল্লের বউ বাড়ি ফিরে তন্ন তন্ন করে খুজল ঐ আংটি। কিন্তু খোঁজাই সার হল, আংটি পেল না।

সেদিন সন্ধ্যায় মল্ল বাড়ি ফেরার পর তার বউ জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা তোমার আংটিটা কোথায় ?"

মল্ল ভাবল তার বউ আংটি দেখে নিয়েছে। তাই সে বলল, "আংটিটা আমি ঐ দরজার কাছে লুকিয়ে রেখেছি।"

পরের দিন মল্ল কাজে বেরিয়ে যাবার পর তার বউ দরজার কাছাকাছি যেখানে যেখানে তার সন্দেহ জেগেছিল তার প্রত্যেকটা খুঁড়ে খুঁড়ে খুঁজল। শেষে পেল সেই আংটি। আংটি বের করে ঐ জায়গাটা বুজে দিল। মল্লের বউ ছুটে গেল রাজার কাছে।

রাজা ঐ আংটি নিয়ে মল্লের বউকে একটা ছোট থলে করে সোনা দিল।

মল্লর বউ খুব খুশী হয়ে বাড়ি ফিরে

বাড়ির পিছনে একটা গর্ত করে ঐ থলি পুঁতে রেখে দিল।

এক সপ্তা হতেই রাজার এক অনুচর মল্লকে বলল, "আংটিটা নিয়ে রাজা তোমাকে ডাকছেন।"

মল্ল তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে ঐ আংটি খুঁজতে লাগল। অনেক খুঁজেও যখন পেল না তখন সে মৃত্যু-ভয়ে, আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল, "আমি মারা গেলাম। আমি আর বাঁচব না!"

মল্ল বউকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি, তুমি আমার আংটি দেখেছ? আমার আংটি?"

মল্লের হাবভাব দেখে বউ ভয় পেয়ে আংটি দেখেনি বলে দিল। মল্ল হতাশ হয়ে পা টেনে টেনে কোন রকমে রাজার কাছে গিয়ে বলল, "মহারাজ, আমি আংটি এক্ষুনি দেখাতে পারছি না।"

"তাহলে কথা মত তোমাকে আজ বধ করা হবে!" রাজা বলল।

"মহারাজ, আমাকে কাল বধ করুন। এই এক দিনে আমি বকেয়া কাজ করে নিচ্ছি।" মল্ল আবেদন করল।

"ঠিক আছে। কাল সকালে তোমাকে বধ করার জন্য আমি কসাইকে তোমার বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।" রাজা বলল।

মল্ল কোন রকমে মনে মনে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফেরার পথে ভাবল, কাল যখন আমাকে মরতেই হবে তার আগে আমার সাধ মিটিয়ে নি। একটা মাছ

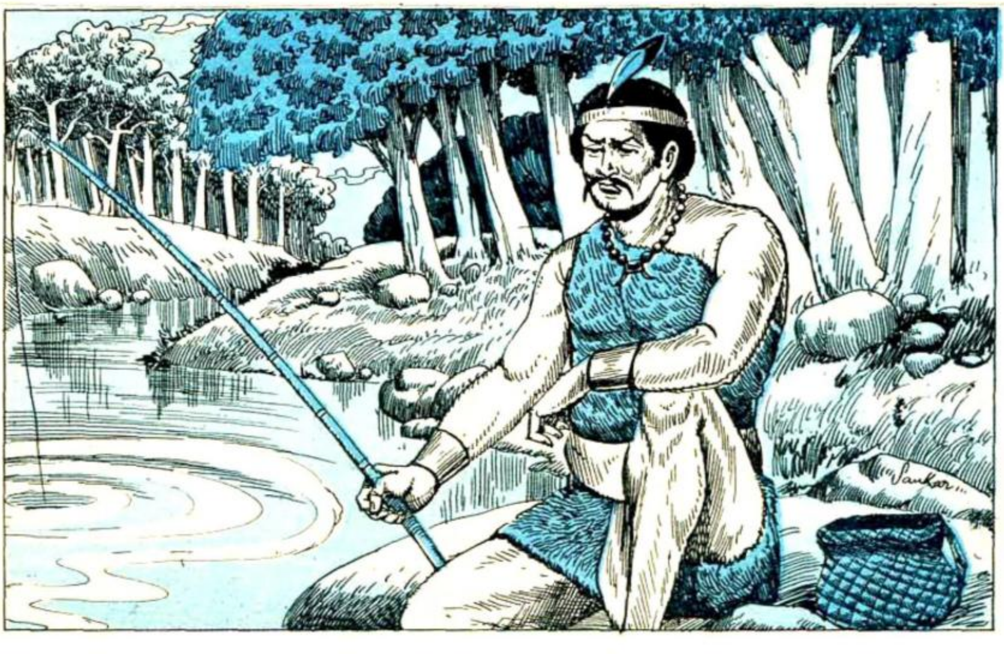

ধরে ভালভাবে রেঁধে খেয়েনি। এই কথা ভেবে সে মাছ ধরতে বসে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ছিপে একটা সাদা মাছ ধরা পড়ল। মল্ল ঐ মাছটাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখে তার বউ বাড়িতে নেই। তখন সে নিজেই মাছটাকে কেটেই চিৎকার করে উঠল, "পেয়েছি! আমি রাজার আংটি পেয়েছি!"

মল্ল ঐ আংটি নিয়ে রাজার কাছে ছুটে যেতে যেতে যার সাথে দেখা হয় তাকেই বলতে লাগল, "আমি ভেবে ছিলাম আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু না! এখন আমি বেঁচে গেছি!"

সে রাজার কাছে পৌঁছাল। তার পিছনে কৌতূহলী লোকও পেঁছাল।

রাজা অনুচরদের জিজ্ঞেস করল, "আরে বাইরে এত লোক কিসের? এত চেঁচামেচি কেন?"

সেই সময় মল্ল তার, পিছনে পিছনে যারা এসেছিল, তাদের নিয়ে, রাজার কাছে গিয়ে বলল, "মহারাজ, এই নিন আপনার আংটি এবং আমার মৃত্যুদণ্ড রদ করুন।"

রাজা বাধ্য হয়ে সবার সামনে মল্লের মৃত্যুদণ্ড রদ করল। কোন্ মায়ায়, কোন্ জাদুর ফলে যে মল্ল ঐ আংটি পেয়ে গেল তা রাজা কিছুতেই ভেবে পেল না। রাজা আর কোন দিন মল্লের কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করেনি।

আসল ঘটনা ঘটেছিল এই ভাবে: মল্লের বউ রাজাকে আংটি দেবার পর রাজা ঐ আংটি নিজের বিছানায় মাথার কাছে রেখেছিল। রাত্রে ঐ আংটি কিভাবে গড়িয়ে একটি পাত্রে পড়ে যায়। ঐ পাত্রে রাজার রাত্রের খাবার জল থাকত। প্রত্যেক দিনের মত সেদিন সকালেও চাকর ঐ পাত্রের জল ফেলে দিয়ে নতুন জল তুলে রাখল। সেই জল আংটি সহ গড়াতে গড়াতে চলে গেছে সেই জলাশয়ে যেটাতে মল্ল ঐ মাছ পেয়েছিল।

এত যে সব ঘটে গেছে তা রাজার অজানা ছিল। তাই রাজা বুঝতে পারেনি কি করে মল্লের হাতে ঐ আংটি গেল।

পার্থক্য

এক গ্রামে মাধব নামে এক জমিদার ছিল। সে অন্যের দুঃখের কথা ভাবত না। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সব কিছু করত।

ঐ গ্রামে গোবিন্দ নামে এক গরীব যুবক ছিল। তার যতটুকু ক্ষমতা ছিল সে তা দিয়ে সব সময় লোকের উপকার করতে চাইত। পরিবর্তে সে কারও কাছ থেকে কিছু নিত না। সেই জন্য গ্রামের লোক সুযোগ বুঝে তার প্রয়োজন মেটাত।

একবার গোবিন্দ কোন কাজে দূরের কোন গ্রামে চলে গেল। সে অনেকদিন গ্রামে ফেরেনি। তার না থাকাতে লোকের খুব অসুবিধা হচ্ছিল। গ্রামের লোকের মনে হচ্ছিল যেন তাদের ডান হাত নেই। ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, "গোবিন্দ যে কোথায় গেল! কেন যে ফিরছে না! আমাদের অসুবিধা সে কি বোঝে না!" নানান লোকের মুখে গোবিন্দ সম্পর্কে অনেক রকমের মন্তব্য শুনে জমিদার মাধব মনে মনে রেগে যেতে লাগল।

মাধবের স্ত্রীও অনেকবার বলল, "গোবিন্দ যে ফেরার নামটি করছে না।"

কানাকড়ি যার মুরোদ নেই সেই গোবিন্দ সম্পর্কে যদি লোকে, তার পিছনে, এত আলোচনা করে তাহলে সে যে এত বড় একজন জমিদার, সে না থাকলে লোকে না জানি কত কথা বলবে। এই ভেবে সে পাশের গ্রামে গিয়ে দু সপ্তা রইল।

জমিদার মাধব ভাবল, না আর দেরি করা উচিত নয়। গ্রামের লোক হয়ত তার অভাবে অস্থির হয়ে পড়েছে। এই সব ভাবতে ভাবতে গাঁয়ে ফেরার সময় সরল নামে এক কিসানের সাথে তার দেখা। মাধব তাকে জিজ্ঞেস করল, "সরল, গাঁয়ের খবর কি?"

"আজ্ঞে, খবর খারাপ হবে কেন? আমাদের গোবিন্দ কালকে ফিরেছে যে! কেন আপনি খবর পাননি?" সরল জবাবে বলল।

"আমি দু সপ্তা গাঁয়ে ছিলাম না।" মাধব জমিদার বলল।

"অ। আচ্ছা। কোই কারো মুখে শুনিনিতো! কেউ আপনার কথা বলে নি।" সরল বলল।

—তাপস দে

উত্তমম্ স্বাজিতম্ বিত্তম্,
মধ্যমম্ পিতুরাজিতম্,
অধমম্ ভ্রাতৃবিত্তঞ্চ,
স্ত্রী বিত্ত মধ্যমাধমম্। ॥ ১ ॥

[নিজের রোজগার করা ধন উত্তম, বাবার রোজগার করা সম্পত্তি মধ্যম, ভাইদের ধন অধম, আর স্ত্রীর ধন অধমের অধম।]

উত্তমম্ কুল বিদ্যায়া,
মধ্যমম্ কৃষি বাণিজ্যাৎ,
অধমম্ সেবকাবৃত্তেঃ,
মৃত্যু শ্চৌর্যোপজীবনাৎ। ॥ ২ ॥

[কুলের বিদ্যা উত্তম, ক্ষেতের কাজ ও ব্যবসা মধ্যম, সেবকবৃত্তি হল অধম, কিন্তু চুরি করে বেঁচে থাকা মৃত্যুর সমান।]

উত্তমে ক্ষণকোপস্যাৎ,
মধ্যমে ঘটিকাদ্বয়ম্,
অধমে স্যা দহোরাত্রম্,
পাপিষ্ঠে মরণান্তকম্। ॥ ৩ ॥

[উত্তম ব্যক্তির রাগ মুহূর্ত কাল থাকে, মধ্যম ব্যক্তির রাগ দুটি মুহূর্ত থাকে, অধম ব্যক্তির রাগ এক দিন ও এক রাত থাকে, কিন্তু পাপীর সারা জীবন থাকে।]

উত্তমম্—মধ্যম—অধমম্

যক্ষপর্বত

সাত

[তান্ত্রিক এবং লোমশ-ভূতের খোঁজ করতে করতে খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত গুহার ভিতরে ঢুকে গেল। কিছুক্ষণ খোঁজার পর তারা এক গোপন পথ দেখতে পেল। সেই গুহার ভিতরে ঢুকে যেতে যেতে তারা পৌঁছাল শিথিল ভবনের কাছে। সেখানে এক উঁচু আসনে আসীন নারী তান্ত্রিককে নির্দেশ দিল খড়্গবর্মা ও জীবদত্তকে বন্দীকরে অক্ষত দেহে আনতে। পরে···]

শিথিল ভবনগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে জীবদত্ত অবাক হয়ে ভাবছিল, কবেকার এই ভবন, কারা ছিল এই ভবনে, কেন এই ভবন জনমানবহীন হয়ে গেল। ইত্যাদি। অন্যদিকে খড়্গ-বর্মার মাথায় অন্য চিন্তা, কতক্ষণে তান্ত্রিক এবং লোমশ-ভূতকে ধরা যায়, তাদের মেরে ফেলা যায়।

কিছুক্ষণ খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত নিজের নিজের চিন্তা ভাবনায় ডুবে ছিল। কারো মুখে কথা নেই। সেই সময় হঠাৎ একটা শব্দ তাদের কানে গেল। কাছের দরজার পাশ থেকে কোন ভারী জিনিস সরানোর শব্দ তারা পরিষ্কার শুনতে পারল।

সেই শব্দ কানে যেতেই খড়্গবর্মা চট্‌পট্ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "জীবদত্ত! এই শব্দ কিসের বলত? ঐ দুই পাজি বদমাইশ গুলো আমাদের উপর আক্রমণ

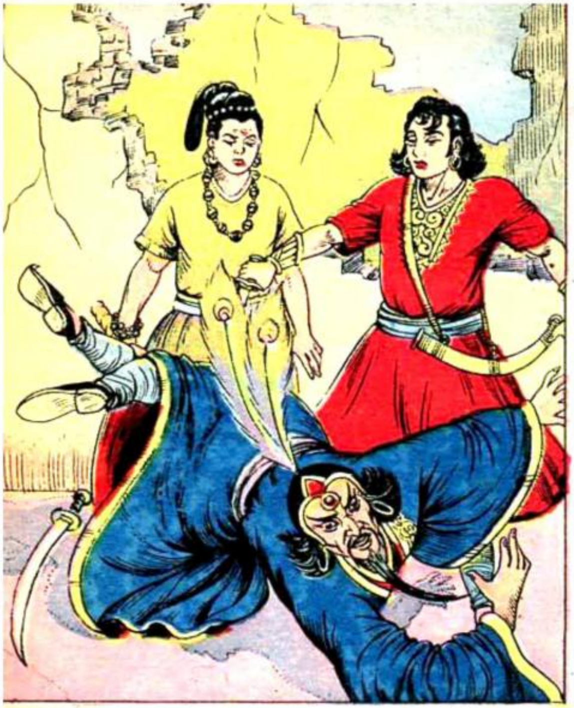

করার তাল করছে না তো ? কি করা যায় বলত ? তাড়াতাড়ি ভেবে বল। মনে হচ্ছে খুব দেরি করা যাবে না। মনে রেখো, কিছু করে যেন আবার ওদের খপ্পরে পড়ে না যাই।"

"আবার একথাও তুমি ভেবো না যে ঐ তান্ত্রিক এবং লোমশ-ভূত আগে পিছে না ভেবে হঠাৎ আমাদের আক্রমণ করার সাহস রাখে। যাই হোক, আমাদের ভীষণ সতর্ক থাকতে হবে।" এই কথা বলে জীবদত্ত উঠে দরজার কাছে গেল।

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত এক পা এক পা করে ঐ শিথিল-ভবনের পাথরের দরজার ওপারের দিকে তাকানোর চেষ্টা করল। হঠাৎ দরজার কাছে তান্ত্রিক লাফিয়ে পড়ে চিৎকার করে বলল, "ওরে এই নর ! তোমাদের দুজনকে আমি এক্ষুনি মহাভূতের কাছে বলি দেব !" তান্ত্রিক জীবদত্তের গলায় তরবারি চালাল।

খড়্গবর্মা তৎক্ষণাৎ নিজের তরবারি দিয়ে তান্ত্রিকের তরবারি রুখে বলল, "চুপ কর আহম্মক, অতই যদি আমাদের বলি দিতে চাও তো আগে দাওনি কেন ? অত বক বক করছ কেন ? আমাদের আর বলি দিতে হবে না, এখন তুমি নিজের প্রাণ বাঁচাও। তোমার চালবাজির, তোমার দুষ্কর্মের উচিত শিক্ষা এক্ষুনি পাবে ! তৈরি হও।" তারপর খড়্গবর্মা তান্ত্রিকের হাত ধরে জোরে টান দেয়। তান্ত্রিক সরে গেল আর সশব্দে দরজা থেকে নীচে পড়ে গেল।

ঠিক তখনই দরজার ওপার থেকে অনেকগুলো কন্ঠস্বর শোনা গেল, "ওরে এই পাগলা তান্ত্রিক ! আমাদের পূজারিণী ওদের মেরে আনতে বলেন নি !"

ইতিমধ্যে 'বলি বলি' বলে চিৎকার করতে করতে লোমশ-ভূত বাঁদরের মত দরজায় লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সে জানত না তার গুরুর কি দশা হয়েছে।

লোমশ-ভূত দরজার পাশে দেখতে পেল তার গুরু ধূলোয় উপুড় হয়ে আছে।

এই না দেখে লোমশ-ভূত আর্তনাদ করে উঠল। আর সেই মুহূর্তে জীবদত্ত তার পা ধরে জোরে একটা টান মারল। লোমশ-ভূত নীচে পড়ে যাচ্ছিল এমন সময় তার পেটে সে কষে একটা লাথি মেরে বলল,"খড়্গবর্মা, আর বেশিক্ষণ আমাদের এখানে থাকা উচিত হবে না। এই গোটা অঞ্চল মনে হচ্ছে যেন তান্ত্রিকের বিবর। আমাদের তাড়াতাড়ি ঐ মহলে ঢুকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। তাড়াতাড়ি চল।"

পরক্ষণেই ওরা দুজনে শিথিল ভবনের দিকে ছুটল। একটি ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে ঘুরে তাকালো। কেউ পেছন দিক থেকে তাদের অনুসরণ করছে কি না দেখার জন্য। কিন্তু ঐ লোমশ-ভূত ও তান্ত্রিক ছাড়া আর কাউকে তারা দেখতে পেল না।

"দরজার ওপার থেকে এক সাথে কয়েক জনের হুঁশিয়ারি তুমি শুনতে পাওনি?" খড়্গবর্মা জিজ্ঞেস করল।

"এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? ঐ হুঁশিয়ারি শুনে আমার মনে হল শিথিল ভবনের পূজারিণী ওদের যে রকম নির্দেশ দিয়েছেন ওরা সেটাই বলে ছিল। আমাদের জ্যান্ত ধরে নিয়ে যেতে পূজারিণী বলেছেন। এখন আমা-দের সাবধানে ঐ পূজারিণীকে ধরার চেষ্টা করতে হবে। এরা বেচারা সব তো ঐ পূজারিণীর চাকর মনে হচ্ছে। এদের ধরে কি হবে। এতো সব ভাড়া

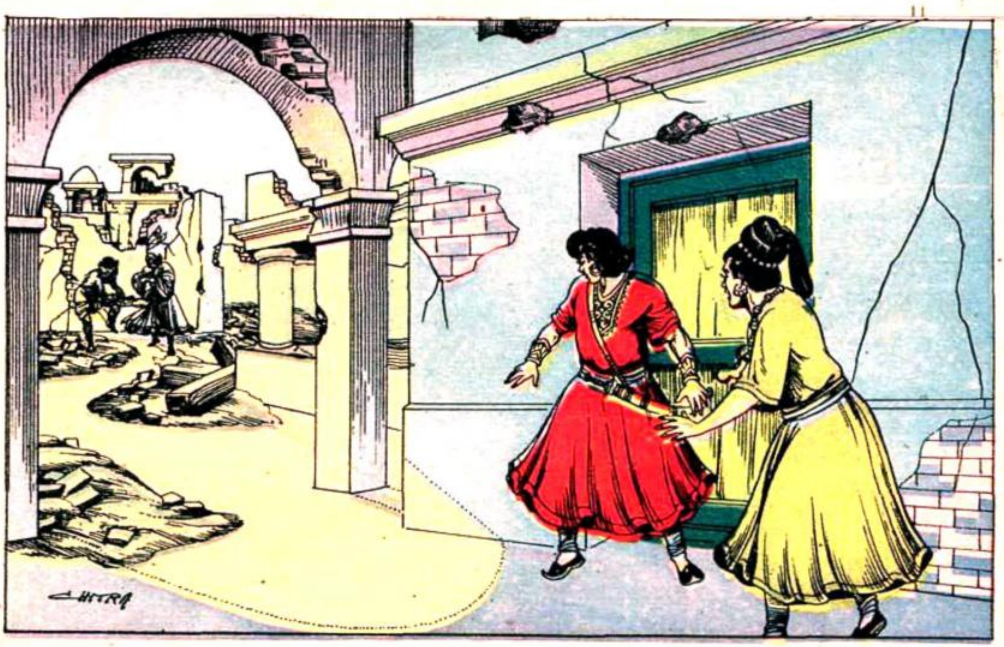

করা টাট্টু ঘোড়া।" জীবদত্ত বলল।

এরপর তারা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল। শত্রু কোন্ দিক থেকে তাদের আক্রমণ করবে, তার আভাস পাওয়ার আশাতেই তারা দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু তারা কিছুতেই টের পেল না। লোমশ-ভূত আর তান্ত্রিক ঐ দরজার কাছে পড়ে পড়ে গোঙাচ্ছিল। শুধু ওদের গোঙানী ছাড়া আর কোন শব্দ তারা শুনতে পেল না।

খড়্গবর্মা দরজার দিকে এক মুহূর্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে বলল, "জীবদত্ত, এই ভারী কাঠের দরজার দিকে ভালভাবে তাকিয়ে দেখ। মনে হচ্ছে এই দরজার পিছন দিক দিয়ে অন্য মহলে যাওয়ার পথ আছে। ঐ দরজা ঠেলে দেখলে কেমন হয়?"

"এ ছাড়া উপায় বা কি আছে! আমরা এখানে এভাবে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব! ঐ তান্ত্রিক আর তার লোমশ-ভূতটাকে ছেড়ে চল আমরা আরও রহস্যের সন্ধান করি। তবে মনে রেখো, দরজা খুব সাবধানে সরাতে হবে। যাদের গলা আমরা পেয়েছি ওরা হয়ত ঐ মারাত্মক দরজার কাছাকাছি আছে। হয়ত ওখান থেকে ওরা তাক্ করে বসে আছে আমাদের আক্রমণ করতে।" জীবদত্ত বলল।

তারপর খড়্গবর্মা একহাতে তরবারি তুলে অন্য হাতে জোরে দরজা ঠেলল। কির্র্ আওয়াজ হল। দরজা নড়ল। কিন্তু খুলল না।

"আচ্ছা এও তো হতে পারে যে দরজা ওদিক থেকে বন্ধ করা আছে। খিল আঁটা আছে? যার ফলে খুলছে না।" এই কথা বলে জীবদত্ত দু হাতে দরজা জোরে ঠেলে দিল। তখন ভয়ঙ্কর আওয়াজের সাথে দরজা খুলে গেল।

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত ভিতরে ঢুকল। ঢুকেই দেখে বিরাট ঘর। কোন মানুষ ঐ ঘরে থাকে বলে মনে হল না। ঘরের

আনাচে-কানাচে বড় বড় মাকড়সার জাল। চাপ চাপ চামচিকের দল। ঐ ঘরের এক দিকের দরজা ভাঙ্গা আর অন্য দিকেরটা হেলান দেয়া।"

"আর দেরি করে কি লাভ ? ভিতরে যখন এসেই গেছি, তখন ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটা ঘর দেখব। তান্ত্রিকের কর্ত্রী পূজারিণীকে খুঁজে বের করতেই হবে।" জীবদত্ত বলল।

দুজনে মিলে ঐ দরজা পেরিয়ে অন্য ঘরে ঢুকল। ঐ ঘর প্রথম ঘরের চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর ছিল। ওদের দেখেই কয়েকটি বিরাট ইঁদুর কোঁক্ কোঁক্ ডাকতে ডাকতে লাফিয়ে এদিকে ওদিকে চলে গেল। বাজের মত বড় পেঁচা হঠাৎ নেবে একটা ইঁদুর ধরে সোজা উঠে একটা জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

"বাবা এ কেমনতর ইঁদুর, আর কি ধরনের পেঁচারে বাবা! এতকাল যতবড় দেখে এসেছি এ দেখছি তার চেয়ে তিন চার গুণ বড়। আচ্ছা এরা কি খায় ? কি খেয়ে এত বড় বড় হয়েছে ?" খড়্গবর্মা জিজ্ঞেস করল।

পূজারিণী হয়ত নিজের মোটা মোটা শিষ্যদের মেরে কেটে এদের মাঝে ফেলে দেন।" এ কথা হাসতে হাসতে বলল জীবদত্ত। মুহূর্তকাল পরে আবার জীবদত্ত বলল,"হুঁ। চলো। যাওয়া যাক। আরও কত বিচিত্র জিনিস দেখতে পাব কে জানে।"

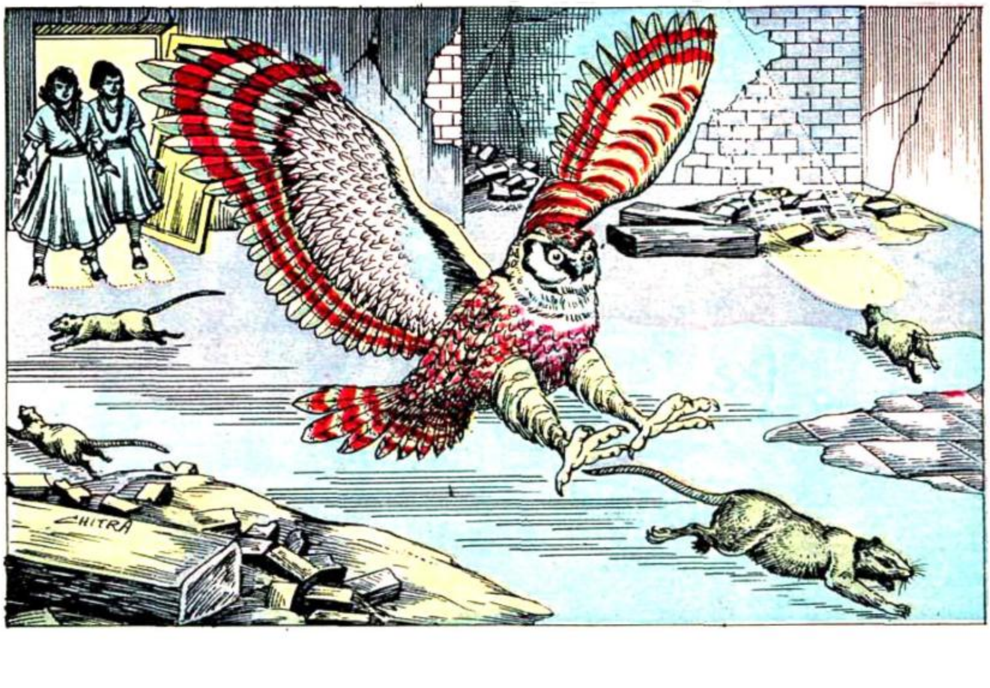

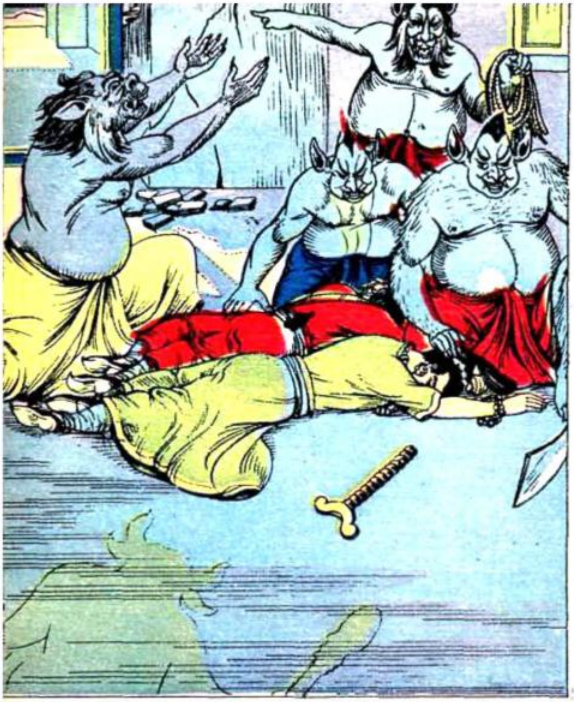

এই ভাবে আরও কয়েকটা ঘর তারা লক্ষ্য করল। কোন মানুষ থাকার চিহ্ন নেই।

"খড়্গবর্মা, আমার মনে হচ্ছে এই পূজারিণীর আদেশ শিষ্যরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। আমাদের হয়ত কেউ অনু-সরণ করছে। পূজারিণীর আদেশ ছিল না আমাদের জ্যান্ত ধরে নিয়ে যাওয়ার? আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা কোন্ ঘর দিয়ে আমরা কোন্ ঘরে ঢুকে পড়লাম।" জীবদত্ত বলল।

"তাহলে আবার আমরা ফিরে যাব?" খড়্গবর্মা জিজ্ঞেস করল।

"আর কী বা করতে পারি। এই শিথিল নগর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একমাত্র পথ ঐ গুহা ছাড়া আর কি আছে! এখন অতদূর পৌঁছাতে পারব কি না কে জানে।" জীবদত্ত বলল।

"আমরা যে কোন্ পথে এসেছি তা ভুলে গেছি। কোন ভাবে এই ঘরগুলোর বাইরে গিয়ে ঐ লোমশ-ভূত আর তান্ত্রিককে মেরে ফেলে এই পূজারিণীর খবর জানব।" খড়্গবর্মা বলল।

এই কথাবলে ওরা পিছু ফিরে দু-চার পা যেতে-না-যেতেই তাদের মাথায় এক সাথে অনেকগুলো লাঠির ঘা পড়ল। তারা সাথে সাথে মাথা ঘুরে চোখ উল্টে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ পূজারিণীর চারজন শিষ্য ওদের ধরে পরীক্ষা করে দেখল রক্ত বেরিয়েছে কিনা। না, এক ফোঁটাও রক্ত বেরোয়নি।

"বাবা, আমাদের বরাত ভাল। ভেবেছিলাম এদের মাথা ফেটে গেছে। এরা মরে গেলে মহাশক্তি পূজারিণী আমাদের জানে মেরে ফেলত। এ-যাত্রা খুব জোর বেঁচে গেছি!" একজন বলল।

"এরা যাতে লাঠির আঘাতে না মরে তার জন্যেইতো লাঠির আগায় আমরা কম্বলের টুকরো জড়িয়ে ছিলাম। এদের হাত পা বেঁধে এবার ঘাড়ে করে নিয়ে যাই পূজারিণীর কাছে।" আর একজন

শিষ্য বলল।

অচেতন খড়্গবর্মা ও জীবদত্তের হাত পা বেঁধে ওরা কাঁধে ফেলে নিল। অনেকগুলো অন্ধকার ঘর পেরিয়ে ওরা শেষে আনল এক বিরাট মণ্ডপে।

মণ্ডপের মাঝে উঁচু মোলায়েম জায়গায় বসে ছিল পূজারিণী। অদূরে হাত বাঁধা অবস্থায় কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিল। পূজারিণী একবার খড়্গবর্মা ও জীবদত্তের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে বলল, "এদের মধ্যে একজন মনে হচ্ছে তান্ত্রিক!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা হতে পারে মহাশক্তি পূজারিণী। এর হাতে একটা মন্ত্রদণ্ডও ছিল। অন্যজনের হাতে ছিল এক তরবারি।" একজন শিষ্য বলল।

"কোথায় সেগুলো? ফেলে আসনি তো ওসব?" পূজারিণী জিজ্ঞেস করল।

"যেখানে এদের ধরেছি সেখানেই ওসব ছেড়ে এসেছি।" শিষ্য বলল।

"যাও, ওসব নিয়ে এস। তোমাদের মাথায় একেবারে গোবর ভরা দেখছি।" পূজারিণী চোখ লাল করে বলল।

পূজারিণীর আদেশ শোনা মাত্র দুজন সেবক ছুটে গিয়ে সেখান থেকে তরবারি ও মন্ত্রদণ্ড নিয়ে এসে পূজারিণীর সামনে সাজিয়ে রেখে দিল। পূজারিণী কিছুক্ষণ সাবধানে ঐ দুটো পরীক্ষা করে

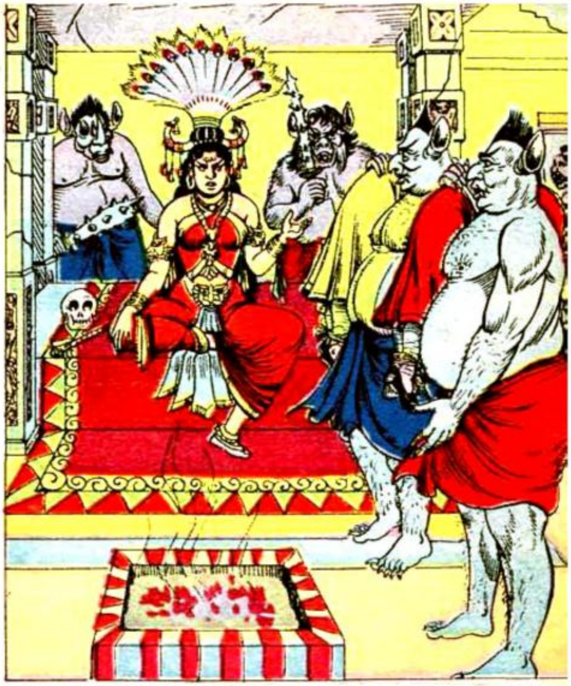

দেখে বলল, "মনে হচ্ছে এ দুটোতেই বিশেষ কোন শক্তি নেই। এদের দুজনকে একটা ঘরে রাখ। এই তরবারি এবং মন্ত্রদণ্ড তাদের পাশে ফেলে রাখ। তারপর দেখি কি হয়।"

তৎক্ষণাৎ চারজন সেবক ঐ অচেতন দুজনকে কাঁধে ফেলে একটা অন্ধকার ঘরে ফেলে রেখে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে শিকল এঁটে দিল।

অনেকক্ষণ পরে জীবদত্তের জ্ঞান ফিরল। সে এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে খড়্গবর্মাকে ডেকে তুলে বলল, "বন্ধু, সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হল আমরা এখনও প্রাণে বেঁচে আছি। আমাদের

অস্ত্রও আমাদেরই কাছে আছে।"

খড়্গবর্মা ঘরের চারদিকে একবার ভাল করে দেখে বলল, "আমাদের না মেরে এভাবে ছেড়ে দেবার পিছনে পূজা-রিণীর কোন কৌশল থাকতে পারে।"

"পূজারিণীকে না দেখে তার কৌশল যে কি তা বুঝতে পারছি না। এখান থেকে আমাদের তাড়াতাড়ি পালানো উচিত।" বলে জীবদত্ত উঠে দাঁড়াল।

"ঐ পাজিগুলো তকে তকে ছিল। সুযোগ পেয়ে আমাদের মাথায় লাঠি চালিয়েছে। এবার কোনক্রমে আমাদের হাতে পড়লে ওদের প্রাণে..."

খড়্গবর্মার কথা শেষ হলনা। ওদের কানে গেল সিংহ গর্জন। তখন খড়্গবর্মা বলল, "পাজিগুলো চাইছে আমাদের উপর সিংহ লেলিয়ে দিতে।"

"তাহলে তো ভালই হবে। সিংহকে ঘুরিয়ে আমরা ওদের পিছনেই লেলিয়ে দিতে পারব। ওদের এই গোটা অঞ্চল তছনছ করে দিতে পারব। মারাত্মক অবস্থা হবে এখানকার।" এই কথা বলে জীবদত্ত নিজের মন্ত্রদণ্ড দিয়ে দরজায় জোরে জোরে আঘাত করল। দরজার একটা অংশ হুড়মুড় করে পড়ে গেল নীচে। পাশের ঘরের সিংহ যেন চমকে উঠল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে গর্জন করতে লাগল।

"হে সিংহরাজ, যত ইচ্ছা তুমি খেতে পার। অনেক খাবার আছে।" এই কথা বলে জীবদত্ত নিজের দণ্ড দিয়ে অন্য এক দরজায় আঘাত করে ভেঙ্গে দিল। দরজা ভেঙ্গে নীচে পড়ে গেল।

পরক্ষণেই পূজারিণীর দশ বার জন সেবক চিৎকার করে বলল, "বন্দীরা পালাচ্ছে! ধর! ধর!" তৎক্ষণাৎ জীব-দত্ত সিংহের কাছে ছুটে গিয়ে ঐ দণ্ড দিয়ে পূজারিণীর সেবকদের দিকে সিংহকে ফিরিয়ে দিল। সিংহ গর্জন করতে করতে ঐ সেবকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

(চলবে)

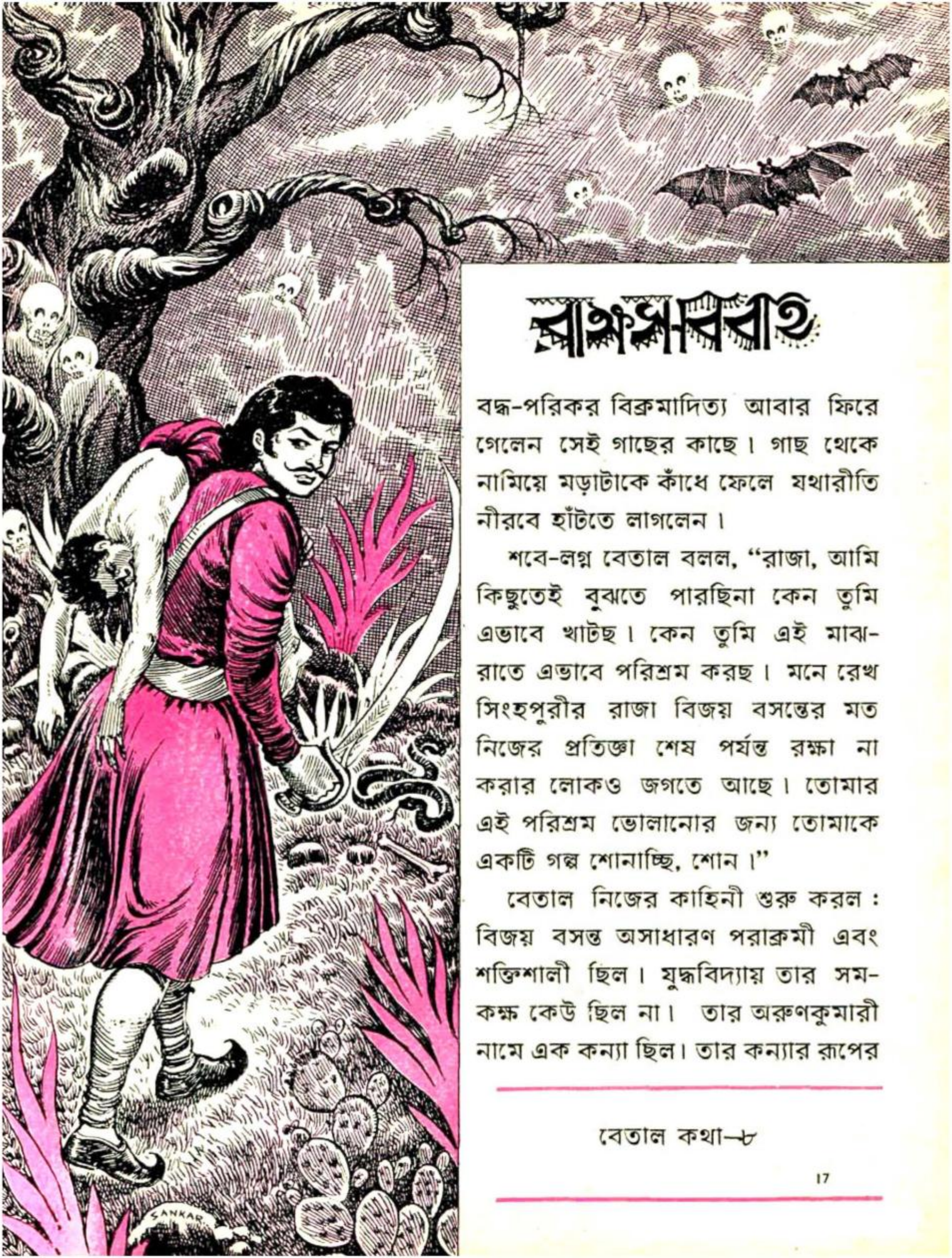

রাক্ষসবরাহ

বদ্ধ-পরিকর বিক্রমাদিত্য আবার ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে নামিয়ে মড়াটাকে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে হাঁটতে লাগলেন।

শবে-লগ্ন বেতাল বলল, "রাজা, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিনা কেন তুমি এভাবে খাটছ। কেন তুমি এই মাঝ-রাতে এভাবে পরিশ্রম করছ। মনে রেখ সিংহপুরীর রাজা বিজয় বসন্তের মত নিজের প্রতিজ্ঞা শেষ পর্যন্ত রক্ষা না করার লোকও জগতে আছে। তোমার এই পরিশ্রম ভোলানোর জন্য তোমাকে একটি গল্প শোনাচ্ছি, শোন।"

বেতাল নিজের কাহিনী শুরু করল: বিজয় বসন্ত অসাধারণ পরাক্রমী এবং শক্তিশালী ছিল। যুদ্ধবিদ্যায় তার সম-কক্ষ কেউ ছিল না। তার অরুণকুমারী নামে এক কন্যা ছিল। তার কন্যার রূপের

বেতাল কথা—৮

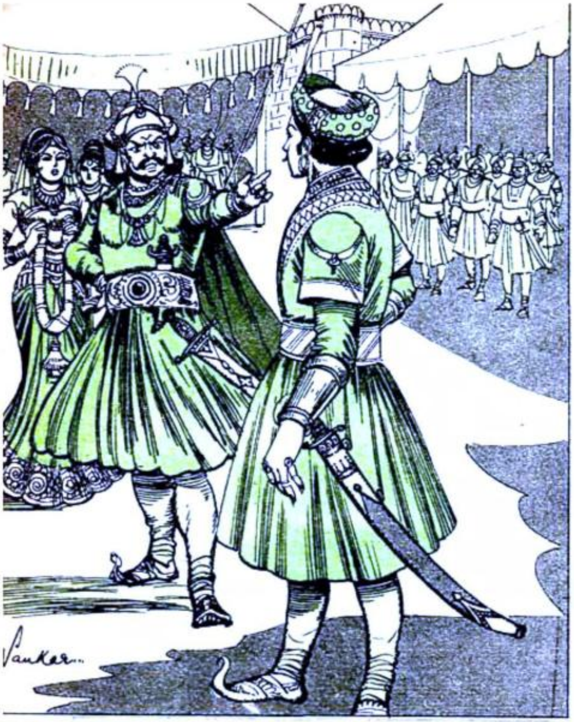

প্রশংসা তার বাবার অসাধারণ ক্ষমতার মত চারদিকে ছড়িয়ে গেল।

অরুণকুমারী বড় হল। রাজদরবারে রাজকন্যার বিয়ে দেবার ব্যাপারে আলোচনা হল। রাজা ঘোষণা করল, "যুদ্ধ বিদ্যায় যে রাজকুমার সবার চেয়ে ক্ষমতাশালী প্রমাণিত হবে তার সাথেই আমার মেয়ের বিয়ে হবে।"

এই ঘোষণার ভিত্তিতে মন্ত্রীরা অরুণকুমারীর স্বয়ম্বর সভার ব্যবস্থা করল। চারদিকে প্রচার করে দিল: যে সমস্ত রকমের যুদ্ধ বিদ্যায় সবাইকে পরাজিত করতে পারবে তার সাথেই রাজকন্যার বিয়ে হবে। এই ঘোষণা সমস্ত দেশেই করানো হয়েছিল। হয়নি শুধু শাকলপুরীতে। কারণ শাকলপুরী এবং সিংহপুরীর মধ্যে বহুদিনের শত্রুতা ছিল।

কিন্তু শাকলপুরীর রাজকুমার কমলশেখর অরুণকুমারীকে বিয়ে করার ইচ্ছা বহুদিন ধরে গোপনে করছিল। অন্য দেশের রাজকুমারের মাধ্যমে সে অরুণকুমারীর স্বয়ম্বরের খবর পেল। তখন সেই রাজকুমারের বন্ধু হিসেবে কমলশেখর স্বয়ম্বর সভায় যোগদান করল।

স্বয়ম্বর সভার দিনে অন্য রাজকুমারদের মত কমলশেখরও ঘোড়ায় চড়া, গদাযুদ্ধ, এবং তীর চালনায় অংশ গ্রহণ করল এবং পরিশেষে অস্ত্র চালনায় সবার সেরা প্রমাণিত হল।

অরুণকুমারী কমলশেখরের গলায় মালা দিতে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ বিজয় বসন্ত কমলশেখরকে আলিঙ্গন করে প্রশ্ন করল, "কুমার, আমি তোমার যুদ্ধ কৌশলে মুগ্ধ হয়েছি। তুমি কোন্ দেশের রাজকুমার। তোমার নাম কি?"

"আমি শাকলপুরীর রাজকুমার। নাম আমার কমলশেখর।" কমলশেখর বলল।

রাজা বিজয়বসন্ত ক্রোধে গর্জে উঠে বলল, "পাজি, এক্ষুণি তুমি এখান থেকে চলে যাও। এবারের মত আমি তোমাকে প্রাণে না মেরে ছেড়ে দিচ্ছি।"

কমলশেখরের রাগ হল। একই রকমের কঠোর কন্ঠস্বরে সে বলল, "যে মুহূর্তে আপনার ঘোষণা অনুসারে আমি জয়ী হয়েছি সেই মুহূর্তেই আপনার মেয়ে আমার স্ত্রী হয়ে গেছে। আমিও দেখতে চাই আমার বিয়ের ব্যাপারে আপনি কিভাবে বাধা দেন।" এই কথা বলে কমলশেখর খাপ থেকে তরবারি বের করল।

বিজয়বসন্তও তরবারি বের করল। দুজনের মাঝে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। সেই যুদ্ধের সময় বিজয়বসন্তের হাতে মারাত্মক আঘাত লাগল।

পরক্ষণেই কমলশেখর অরুণকুমারী-কে ঘোড়ায় চড়িয়ে নিজের দেশের দিকে রওনা হয়ে গেল। বিজয়বসন্ত যুদ্ধ-ভেরী বাজাল। নিজের সমস্ত সেনা নিয়ে শাকল-পুরীর দিকে এগিয়ে গেল।

পরের দিন সকালে শাকলপুরীর সেনা যুদ্ধে নামল। সেনাদের সামনে ছিল কমল-শেখরের সাথে স্বয়ং অরুণকুমারী।

নিজের কন্যাকে দেখেই বিজয়বসন্ত নিজের সেনাকে যুদ্ধ করতে বারণ করে দিল। নিজের কন্যা এবং জামাতাকে আশীর্বাদ করে ওদের শাকলপুরীতে ঢুকল। কমলশেখরের বাবার সাথে মৈত্রী স্থাপন করল। নিজের কন্যার বিয়ে ঘটা করে সম্পন্ন করিয়ে বিজয়বসন্ত নিজের দেশে ফিরল।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বিক্র-

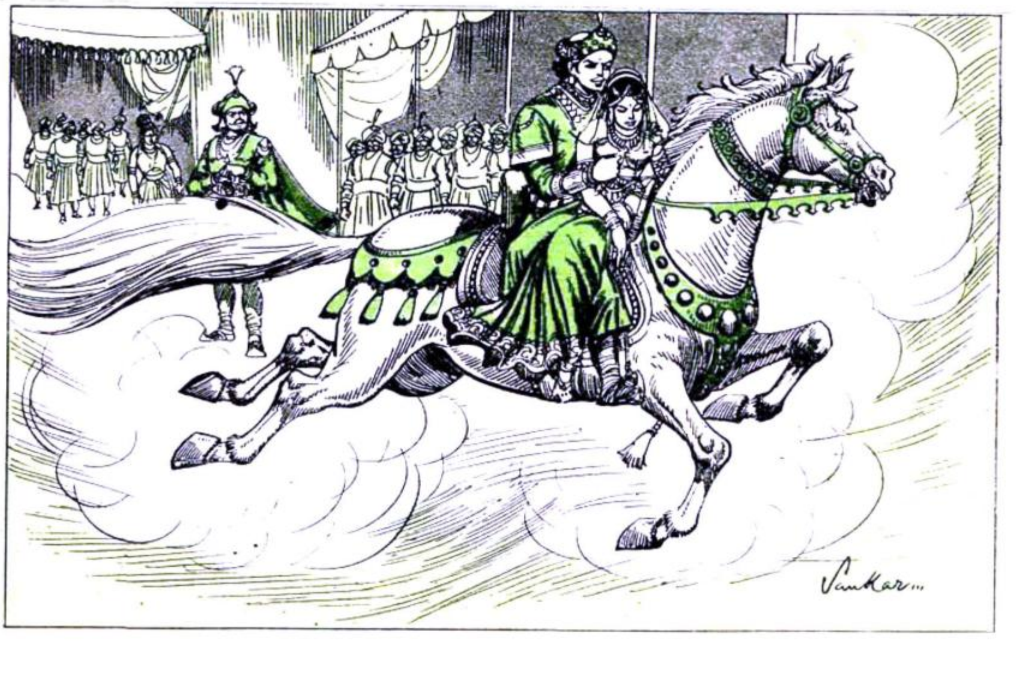

মাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করল, "রাজা, অতবড় পরাক্রমশালী রাজা বিজয়বসন্তের এই ধরণের কাজের উদ্দেশ্য কি? নিজের ঘোষণা অনুযায়ী যে রাজকুমার জয়ী হল তার সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইল না কেন? তাকে মেরে ফেলার জন্য অস্ত্র বের করল কেন? পরে তার দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সমস্ত সেনা নিয়ে গেল কেন? এই প্রশ্ন-গুলোর জবাব জানা সত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

একথায় বিক্রমাদিত্য বলল, "অরুণ-কুমারীর স্বয়ম্বর সভায় কমলশেখরকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। তাই, ঐ স্বয়ম্বর সভায় তার অংশগ্রহণ করার অধিকার ছিল না। কমলশেখর বিজয়বসন্তের শত্রুর ছেলে। অতএব সেও শত্রু। তা সত্বেও বিজয়বসন্ত কমলশেখরকে প্রাণে না মেরে ছেড়ে দিতে রাজী ছিল। কিন্তু কমলশেখরই প্রথমে তরবারি বের করল। আক্রমণ যে করে তাকে আক্রমণ করা অপরাধ নয়। বিজয় বসন্তের যুদ্ধ করতে যাওয়াও যুক্তি সঙ্গত। নিজের কন্যাকে স্বয়ম্বর সভা থেকে হঠাৎ কমল-শেখরের ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে ঐ বিয়ে রাক্ষস-বিয়েতে পরিণত হয়েছিল। তাই বিজয়বসন্ত নিজের কন্যাকে উদ্ধার করতে যুদ্ধ করতে এগিয়ে গেল। কিন্তু যুদ্ধ-ক্ষেত্রে কমল-শেখরের পাশে নিজের কন্যাকে দেখে বিজয়বসন্ত পরিষ্কার বুঝল যে এ বিয়েতে মেয়ের পুরো মত আছে। যে কুমার জোর করে নিয়ে গেছে তাকেই নিজের মেয়ের পছন্দ। সেক্ষেত্রে ঐ বিয়ে আর রাক্ষস-বিয়ে হিসেবে ধরা যায় না। সেই জন্য, বিজয়-বসন্ত সানন্দে মেয়ের বিয়ের মত দিল। আর জামাইয়ের সাথে শত্রুতার সম্পর্ক রাখা অনুচিত ভেবে তার বাবার সাথে মৈত্রী স্থাপন করল।"

রাজা মৌনভাব ভঙ্গ করার সাথে সাথে বেতাল শব উধাও হয়ে আবার সেই গাছে উঠে গেল। (কল্পিত)

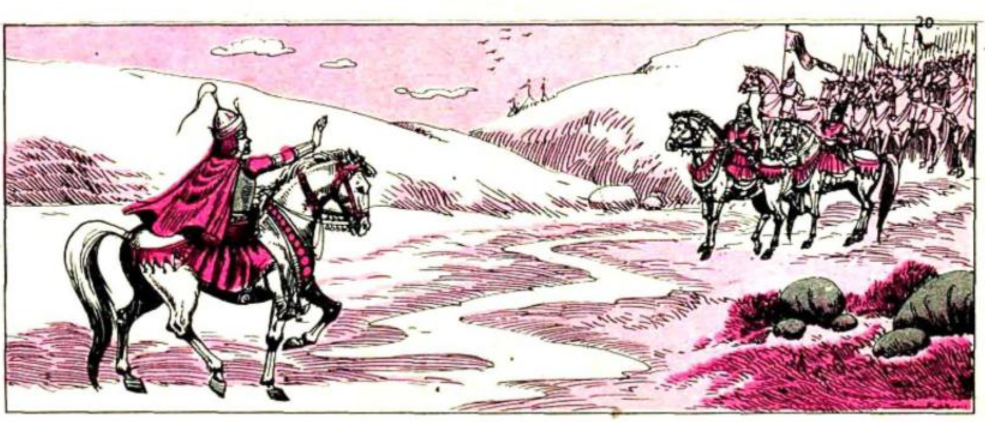

তিন মূর্খের গল্প

চন্দ্রাবতী নদীর তীরে নন্দপুর নামে এক গ্রাম ছিল। নানান কারণে এই গ্রামের নাম ডাক ছিল। নন্দপুরের লোকের হাটে যেতে হলে একটা সাঁকো পেরিয়ে যেতে হত। ঐ নদীর সাঁকোর মুখে দুজন গ্রামবাসীর দেখা সাক্ষাৎ হল।

একে অন্যকে প্রশ্ন করল, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? কেন যাচ্ছেন ?"

"হাটে ছাগল কিনতে যাচ্ছি।" অন্যজন জবাব দিল।

"কোন্ পথে ফিরবেন ?" প্রথমজন আবার প্রশ্ন করল।

"কেন, এই সাঁকোর পথেই ফিরব।" দ্বিতীয়জন বলল।

"আমি তোমাকে এই পথে যেতে দিলে তো !" এ কথা বলে প্রথমজন এক পাল ছাগল হেঁকে তাড়িয়ে দেবার অভিনয় করল। তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়জন এমন অভিনয় করল যেন তাড়ানো ছাগলগুলোকে সে আবার জড় করার চেষ্টা করছে।

ঐ দুজন মূর্খ ছাগলগুলোকে তাড়ানোর এবং জড় করার অভিনয় করার সময় তৃতীয়জন সেখানে হাজির হল। তার মাথায় এক ঘড়া দুধ। লোকটা ওদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কি বুঝল কে জানে। তাড়াতাড়ি ঘড়া নামিয়ে ঘড়ার সব দুধ নদীতে ফেলে দিল। তারপর তাদের সামনে খালি ঘড়া নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এখন বল দিকি, এই ঘড়াতে কত দুধ আছে ?"

"এক ফোঁটাও নেই।" দুজন মূর্খই এক সাথে বলল।

"তোমাদের দুজনের মগজে গোবর ভরা আছে।" তৃতীয়জন বলল।

—বনমালা আচার্য

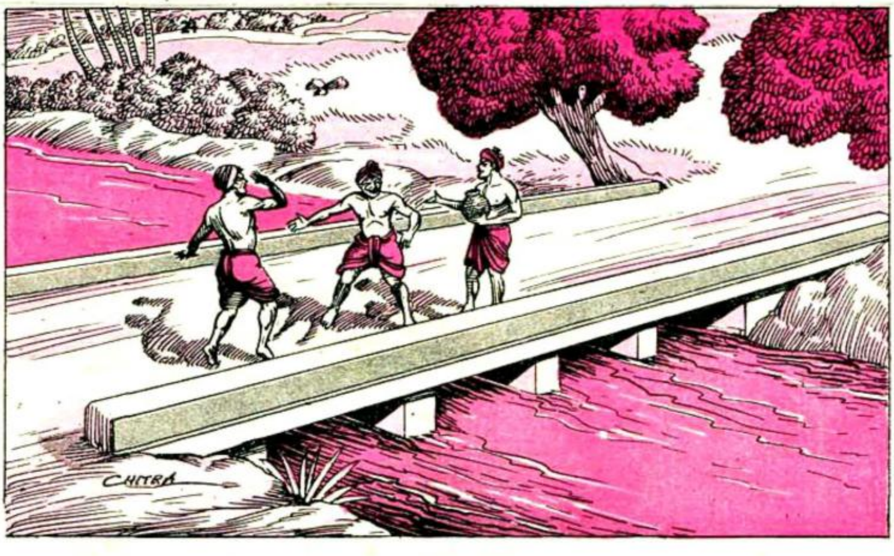

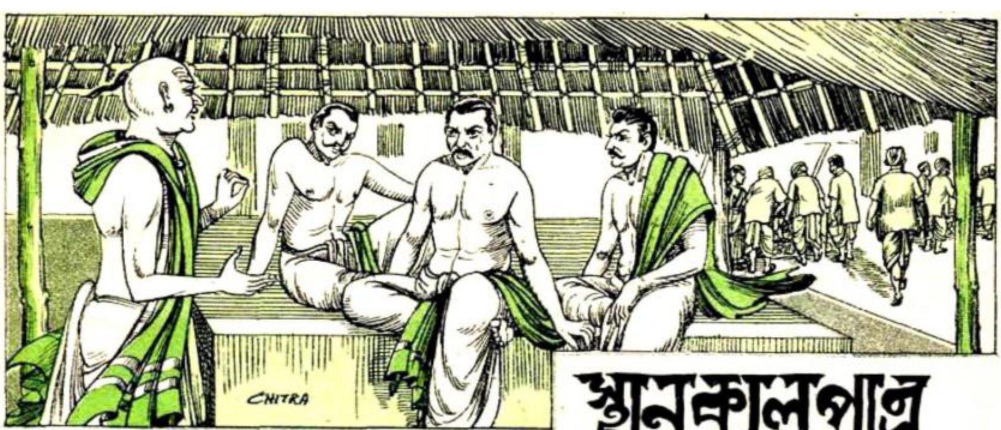

স্থানকালপাত্র

এক গ্রামে ভদ্রসেন নামে এক নাম করা জ্যোতিষী ছিল। আশপাশের প্রত্যেক গ্রামের লোক তার কাছে হাত দেখিয়ে যেত। সে যে কোন লোকের হাত দেখে তার মনের কথা বলে দিতে পারত। সাথে সাথে সে তার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বলে দিত।

ভদ্রসেনের যশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে ঐ অঞ্চলে অন্য কোন জ্যোতিষী ঢুকে পড়লে ভদ্রসেন তাকে নানান প্রশ্ন করে গ্রামবাসীর সামনে অপমান করে ফেরত পাঠিয়ে দিত।

একবার ঐ গ্রামে রামশাস্ত্রী নামে এক জ্যোতিষী গেল। ভদ্রসেন যে সেই গ্রামে থাকে তা রামশাস্ত্রী জানত না।

ভদ্রসেন জানতে পারে রামশাস্ত্রী একজন জ্যোতিষী। সে রামশাস্ত্রীকে পঞ্চানন তলায় ডেকে অনেক প্রশ্ন করল, "হস্ত-সামুদ্রিক শাস্ত্রের কোন্ ভাগ তুমি পড়েছ? কোন্ গ্রামের লোক তুমি? আদি বাড়ি কোথায় ছিল?"

"আজ্ঞে, হস্ত-সামুদ্রিক শাস্ত্র সম্পর্কে আমার জ্ঞান সীমিত! আমি যেটুকু জানি তাই জানিয়ে কোন রকমে পেট চালাই। যে গ্রামের লোক খেতে দেয় সেই গ্রামকেই নিজের গ্রাম মনে করি।" রামশাস্ত্রী সবিনয়ে জবাব দিল।

পঞ্চানন তলায় ইতিমধ্যে অনেক লোক জড় হয়েছিল। রামশাস্ত্রীর বিনয় ভাব লক্ষ্য করে ভদ্রসেন অবাক হয়ে বলল, "তোমার বিদ্যের বহর দেখে এই গ্রামের লোক তোমাকে খেতে দেবে কোন্ দুঃখে? ভাল কথা, তুমি কি আমার নাম শোননি? হস্ত-সামুদ্রিক শাস্ত্রে আমার গভীর জ্ঞান আছে। অতএব, বুঝতে পারছ, আমি থাকতে এ গ্রামে তোমায়

প্রশান্ত নায়ক

থাকতে দেওয়া তো দূরের কথা এক ফোঁটা জলও কেউ তোমাকে দেবে না। তাই বলছি, অন্য কোন গ্রামে চলে যাও, তোমার তাতে ভালই হবে।"

এ কথা শুনে রাম শাস্ত্রীর ভীষণ রাগ হল। মনে মনে সে ঠিক করল, ভদ্র-সেনের অহঙ্কার চূর্ণ করেই সে এই গ্রাম থেকে যাবে। সে শান্ত স্বরে বলল, "আজ্ঞে, আমাকে হেয় করার চেষ্টা করছেন। একমাত্র পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রমাণ হয় কে বড় কে ছোট।"

সেখানে যারা ছিল তারা বলল, "রামশাস্ত্রী ঠিক কথা বলছেন। কোন অজানা লোকের হাত দুজনে দেখলে প্রমাণ হয়ে যাবে কার জ্ঞান কত বেশি।"

এমন সময় নতুন একজনকে ওরা দেখতে পেল। লোকটা ধনী। পঞ্চানন তলার লোক তাকে ডেকে বলল, "এই যে ও মশাই, শুনুন। এখানে দুজন জ্যোতিষীর মধ্যে কে যে বড় তার একটা পরীক্ষা হবে। আপনি এই দুজন জ্যোতিষীকে হাত দেখান।"

ধনী লোকটা পঞ্চানন তলায় এসে হাত বাড়াল। ভদ্রসেন লোকটার হাতে চোখ বুলিয়ে বলল, "দেখুন মশাই, এখানে পরীক্ষা হচ্ছে। রেখে ঢেকে বলতে পারছি না। যা সত্য তা বলে দিচ্ছি।

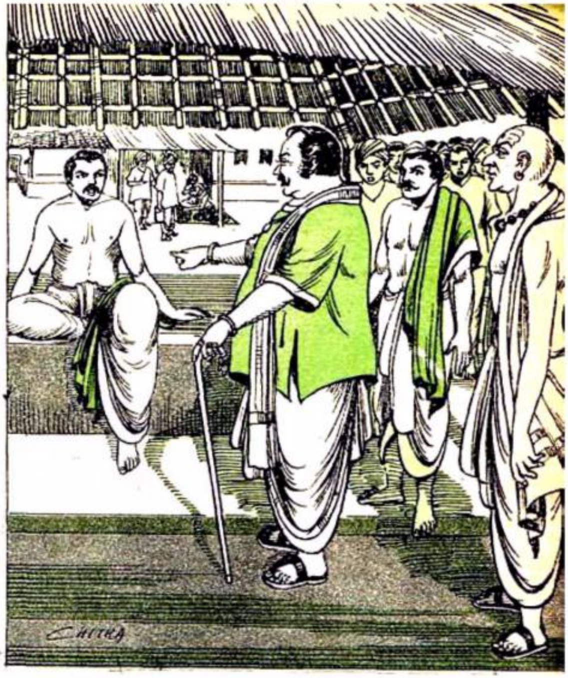

আপনার অগাধ ধন সম্পত্তি আছে। কিন্তু আপনি হাড়কেপ্পণ লোক। আপনি বউয়ের কথা মত ওঠেন বসেন।"

ধনী লোকটা তেলে বেগুনে চটে গিয়ে বলল, "চমৎকার! অপমান করার জন্য আমাকে ডেকেছেন আপনারা?"

রামশাস্ত্রী ঐ লোকটাকে বলল, "দেখুন মশাই, অত রাগ করছেন কেন? জগতে কিছু লোক আছেন যাঁরা নিজেদের জ্যোতিষ শাস্ত্রে পণ্ডিত মনে করেন। সমস্ত জ্যোতিষ শাস্ত্র যেন তাঁরাই গুলে খেয়েছেন। আপনার হাত একটু দেখতে দিন তো। বা! আপনার হাত তো লক্ষ্মী হাত। রেখায় রেখায় উদারতা

ফুটে উঠেছে। বড় বড় লোক আপনার কাছে বেড়ালের মত নত হয়। আপনার পূর্বজন্মের পুণ্যের ফলে আপনি মনের মত আপনার উপযুক্ত স্ত্রী পেরেছেন।"

এ কথা শুনে ধনী লোকটার খুব আনন্দ হল। সে বলল, "সাবাস, আপনার প্রত্যেকটা কথাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য।" সবাই তার কথা যেন গিলছে। তারপর রামশাস্ত্রী বলল, "এই মুহূর্তে আপনার কি ইচ্ছে করছে বলে দিতে পারি।"

"কি বলুন?" ধনী জিজ্ঞেস করল।

"আমার জ্যোতির্বিদ্যায় মুগ্ধ হয়ে এই আংটিটা আপনি আমাকে উপহার দেবার কথা ভাবছেন।" রামশাস্ত্রী বলল।

এ কথা শুনে ধনী লোকটা কেমন যেন দমে গেল। রামশাস্ত্রী তাকে বলল, "আমি কি ঠিক কথা বলিনি? আপনি অস্বস্তি বোধ করছেন নাকি?"

ধনী লোকটা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "আরে না, না, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আমি ভাবছিলাম আমার মনের কথা কি করে জানতে পারলেন? আপনার অসীম ক্ষমতা।"

এ কথা বলে ধনী লোকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের দামী আংটিটা বের করে দিয়ে নিজের পথে চলে গেল। তারপর পঞ্চানন তলায় যারা ছিল তারা দুহাত তুলে রামশাস্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাল। পঞ্চমুখে তারা তাকে প্রশংসা করল। পরীক্ষায় রামশাস্ত্রী যে জিতেছে এ-কথা যেন খুব ভাল ভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে। ভদ্রসেন মাথা নীচু করে বসে রইল।

তখন পঞ্চানন তলার সবাইকে রামশাস্ত্রী বলল, "দেখুন, ভদ্রসেন সত্যি হস্ত সামুদ্রিক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। কিন্তু এই বিদ্যাকে যদি পেশা করতে হয় তাহলে আমার মত লোকের পক্ষে শাস্ত্র জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। স্থান কাল পাত্র জ্ঞানও থাকা চাই। বাস্তব জ্ঞান না থাকলে অহঙ্কার বেড়ে যায়। আর অহঙ্কার বেড়ে গেলেই অপমানিত হতে হয়।

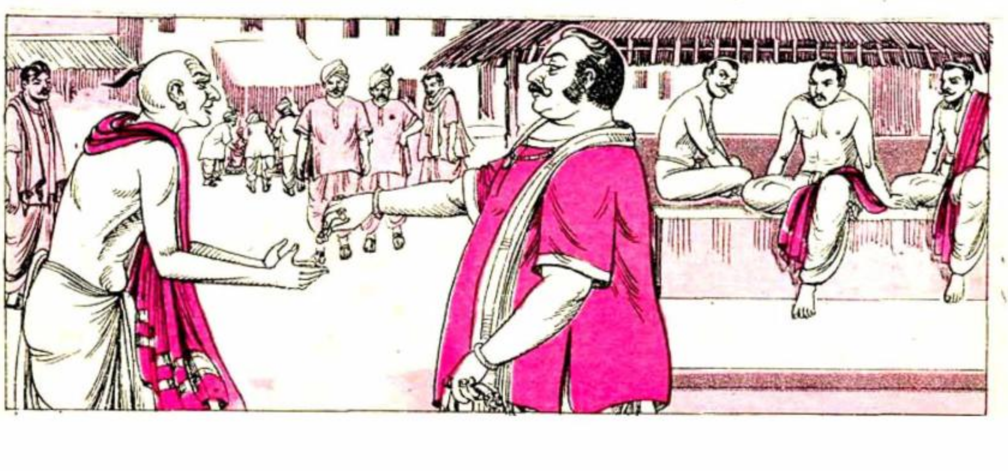

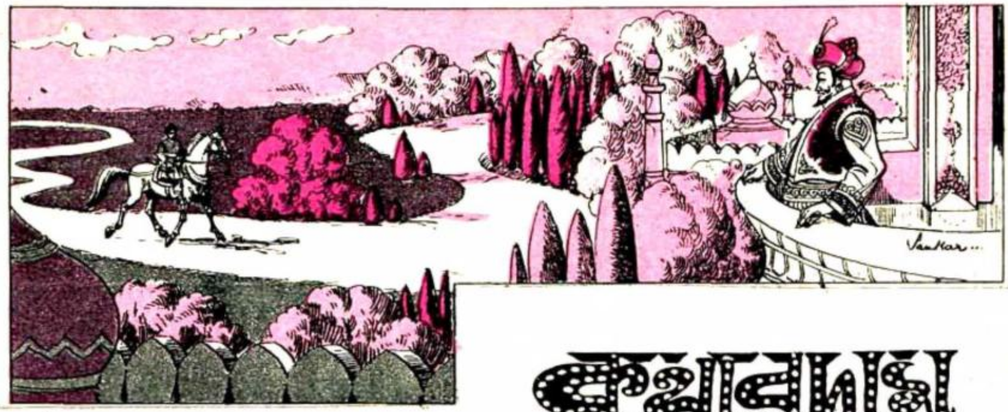

কথার দাম

প্রাচীনকালে তুর্কী দেশে আব্দুল হামীদ নামে এক ব্যবসাদার ছিল। তার কাছে আরবের উঁচু জাতের দুষ্প্রাপ্য ঘোড়া ছিল। আব্দুল ঐ ঘোড়াটাকে খুব ভাল-বাসত। কিন্তু তার বয়স হয়ে গিয়েছিল। তাই সে ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারত না। অগত্যা ঠিক করল ঘোড়াটাকে তিনশো সোনার মোহরে বিক্রী করবে

একদিন আজীজ নামে এক যুবক আব্দুলের কাছে এসে নুয়ে সেলাম করে বলল, "হুজুর, আমি এক খানদানী পরিবারের ছেলে। তবে আমরা এখন গরীব হয়ে গেছি। আপনার ঘোড়া খুব পছন্দ হয়েছে। কিন্তু এক্ষুনি আপনার ঘোড়ার দাম আমি দিতে পারছি না। আপনি দয়া করে আমাকে ঘোড়া দিলে আমি ভিন দেশে গিয়ে রোজগার করে আনতাম। আমি এক বছর অন্য দেশে যা রোজগার করব তা এনে দেব।

আব্দুল কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "খুব ভাল কথা। কথা যদি রাখতে পার, ঘোড়াটাকে তুমি নিয়ে যাও।" এই কথা বলে আব্দুল ঘোড়া এবং চাবুক আজী-জের হাতে সঁপে দিল।

আজীজ খুব খুশী হয়ে সেই ঘোড়ায় চড়ে কিছুদিন সফর করার পর সে এক শহরে পৌঁছাল। সে যখন রাজমহলের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন বাদশাহ জানলা দিয়ে আজীজকে দেখতে পেল, নজরে পড়ল উঁচু জাতের, আরবের দুষ্প্রাপ্য ঘোড়া। ভাবল নিজের কাছে ঐ ধরণের একটা ঘোড়া থাকলে ভালই হত।

বাদশাহ তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাল আজীজের কাছে। বাদশাহের লোক আজীজকে সরাইখানা থেকে ডেকে আনল বাদশাহের কাছে। বাদশাহ

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

বলল, "আমি তোমার ঘোড়া কিনতে চাই, বল তোমার ঘোড়ার দাম কত ?"

আজীজের ইচ্ছা করছিল না ঐ ঘোড়াটাকে বিক্রী করতে। কিন্তু বাদশাহ স্বয়ং যখন ডেকে পাঠিয়ে ঘোড়াটাকে কিনতে চাইছে তখন বেচব না বলা যাবে না। তাই আজীজ ঠিক করল যত বেশী পারবে দাম হেঁকে বসবে। সে বাদশাহকে বলল, "আজ্ঞে এই ঘোড়ার দাম নয়শো সোনার মোহর পড়বে।"

বাদশাহের কাছে এই দাম খুব বেশী মনে হল। আবার ঘোড়াটাকে হাতছাড়া করতেও তার ইচ্ছা করছিল না। তাই সে আজীজকে বলল, "তুমি অনেক বেশী দাম বলছ। আচ্ছা আজকের দিনটা আমাকে ভাবতে দাও। কাল আমি এর দাম বলব।" একথা বলে বাদশাহ আজীজকে যাওয়ার অনুমতি দিল।

আজীজের চলে যাওয়ার পর বাদশাহ উজীরদের ডেকে জিজ্ঞেস করল, ঘোড়াটাকে কিভাবে, কত দামে কেনা যায়। বাদশাহের কথা শুনে এক এক উজীর এক এক ধরণের পরামর্শ দিল। কারো পরামর্শই তার মনে ধরল না।

তারপর প্রধান উজীর বলল, "জাহাঁ-পনা, কাল আমরা আজীজের সাথে উদ্যানে দেখা করব। আপনার কন্যা শাহজাদীকে দিয়েও আপনি ঘোড়ার দর করাবেন। তখন আমার ধারণা সে কম দামে ঘোড়া বিক্রী করে দেবে। আর তা না করলে এমন ব্যবস্থা করব যাতে আমাদের দেশ থেকে আজীজ পালাতে না পারে। তখন দেখবেন সে ঘোড়াটাকে জলের দামে বিক্রী করতে বাধ্য হবে।"

এই পরামর্শ বাদশাহের ভাল লাগল। উজীরকে পরের দিন হুকুম দিল আজীজকে উদ্যানে আনতে। উদ্যানে নিজের যাওয়ার আগে শাহজাদীকে পাঠিয়ে দিল। শাহজাদী সমস্ত জেনে নিয়েছিল। আজীজ ঐ উদ্যানে ঘোড়ায় চড়ে ঢুকল। এক প্রান্তে একা বসেছিল

শাহজাদী। আজীজের ভীষণ ভাল লাগল শাহজাদীকে। আর শাহজাদী ভাবল, এই ঘোড়ায় চড়ে বাবা কি করবে। তার চেয়ে আজীজকেই ভাল মানাচ্ছে।

শাহজাদী ঘোড়াটাকে ভাল করে দেখার অভিনয় করতে করতে আজীজ-কে বলল, "তুমি এখন এই ঘোড়া কম দামে বিক্রী না করলে প্রাণে বাঁচতে পারবে না। এখান থেকে পালানো ছাড়া আর অন্য কোন পথ এখন খোলা নেই। আমার কাছে একটা কোট আছে। সেই কোটে কয়েক হাজার সোনার মোহর সেলাই করে লাগানো আছে। আমার বাবা এখানে তোমার সাথে কথা বলতে এলেই তাকে বলবে তোমার তেষ্টা পেয়েছে। আমি অন্দর মহলে গিয়ে কোট পরে জল এনে তোমার হাতে যেই দিতে যাব তুমি তৎক্ষণাৎ আমাকে তুলে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে পালাবে।

বাদশাহ উদ্যানে এল। আজীজ তৃষ্ণার কথা জানাল। শাহজাদী জল আনার অজুহাতে অন্দর মহলে চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে কোট পরে জল নিয়ে উদ্যানে এল। আজীজ হাত বাড়িয়ে শাহজাদীর হাত থেকে জল নেবার অভিনয় করে হঠাৎ শাহজাদীকে ঘোড়ায় বসিয়ে মুহূর্তে ঘোড়ায় চড়ে বিদ্যুৎ গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে হাওয়া হয়ে গেল।

বাদশাহ আজীজের পিছনে নিজের লোকজনকে ঘোড়ায় চড়িয়ে ছোটালেন।

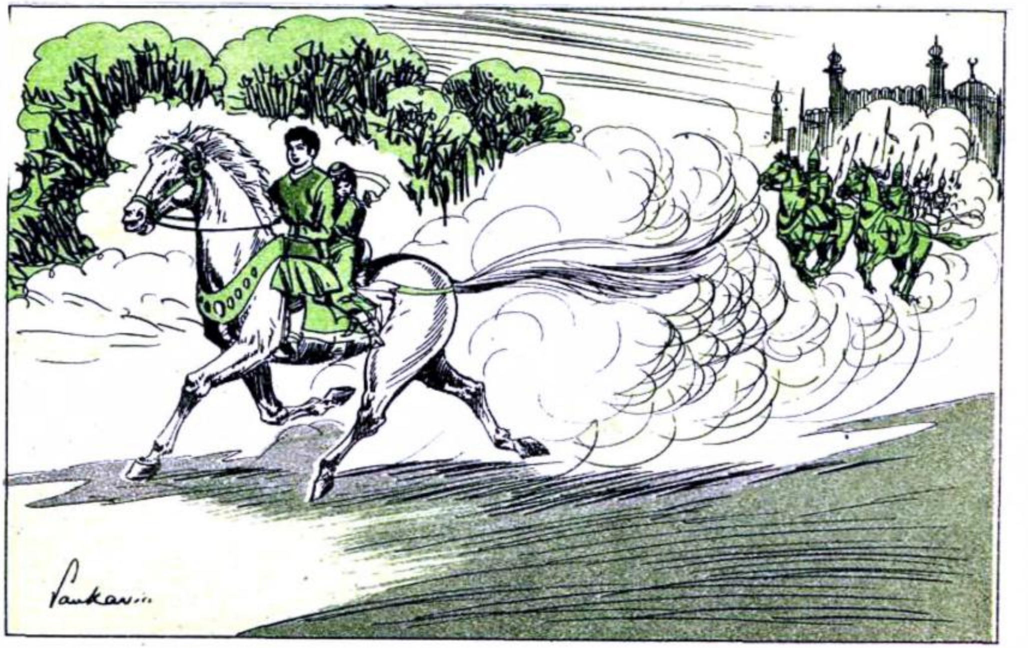

কিন্তু তারা কোনক্রমেই আজীজকে ধরে আনতে পারল না। তারপর শাহজাদীকে নিয়ে দেশে আজীজের চমৎকার কাটছিল।

এক বছর হতে চলল। শর্তের কথা মনে পড়ল আজীজের। মন খারাপ হয়ে গেল। শাহজাদী তার এই মনমরা অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করল।

আজীজ আব্দুল হামীদের কাছে যে শর্ত করেছিল তা জানাল "আমি যে আব্দুলকে কথা দিয়েছি, এই ঘোড়ার কল্যাণে, আমি এক বছরের মধ্যে যা প্যাব তা তাকে দেব। এই ঘোড়ার জন্য আমি পেয়েছি এই কোট আর তোমাকে। তোমাকে ছেড়ে বাঁচব কি করে।"

শাহজাদী বিস্মিত হয়ে বলল, "তা কি করে হয়! তুমি তো আমাকে ভালবেসেছ। আমাকে ভালবাস বলেই তো আমি আমার সবকিছু ছেড়ে তোমার সাথে চলে এসেছি। আব্দুলকে তুমি না হয় এক হাজার সোনার মোহর দিয়ে দাও। সে খুব খুশী হবে।"

কিন্তু এই পরামর্শ আজীজ মেনে নিতে পারল না। সে ঠিক করল যত কষ্টই হোক না কেন সে তার কথা রাখবে।

আজীজ আব্দুলকে বলল, "আমি অনেক দেশ ঘুরে এসেছি। আপনার ঘোড়ার কল্যাণে আমি এই সোনার মোহর সেলাই করা কোট এবং এই শাহজাদীকে পেয়েছি। ঘোড়ার দামের পরিবর্তে আপনি আপনার প্রাপ্য এই কোট এবং শাহজাদীকে গ্রহণ করুন।"

আজীজের সততার পরিচয় পেয়ে আব্দুল সস্নেহে হাসতে হাসতে তাকে বলল, "আমি তোমার সততায় মুগ্ধ। এই কোট আমার কাজ দেবে। এতে যে সোনা আছে আমরা দুজনে ভাগ করে নেব। ঘোড়া এবং শাহজাদী আজীবন তোমারই থাকবে। তোমাদের মঙ্গল হোক।" এই কথা বলতে বলতে আব্দুল আজীজ ও শাহজাদীকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করল।

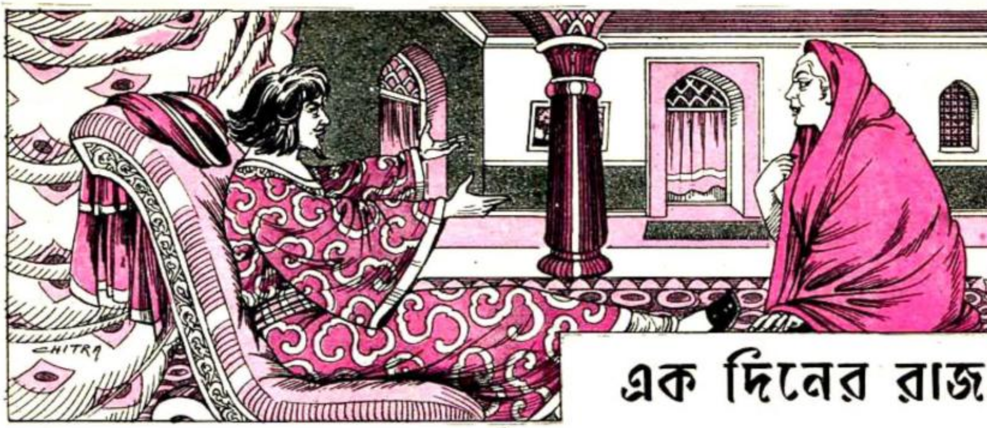

এক দিনের রাজা

পাঁচ

বাদশাহ আবুলের কথায় প্রসন্ন হয়ে বললেন, "আবুল, এমন নিঃস্বার্থ বন্ধু আমার খুব পছন্দ। এই মুহূর্ত থেকে আমি তোমাকে আমার অনুচরের পদে নিযুক্ত করছি। এই প্রাসাদে তোমার অবাধ স্বাধীনতা থাকবে। রাণী জুবেদার অন্দর মহলে ঢোকার অনুমতি কেউ পায়নি। কিন্তু তোমাকে সেই অনুমতি আমি দিচ্ছি।"

বাদশাহের প্রাসাদেই আবুল হোসেনের থাকার ব্যবস্থা হল। তখনই তার হাতে দশ হাজার দিনার খরচ করার জন্য দেওয়া হল। বাদশাহ কথা দিলেন আবুলের সুবিধা অসুবিধার দিকে তিনি নজর রাখবেন। তারপর বাদশাহ দর-বারে চলে গেলেন।

আবুল হোসেন তক্ষুনি ছুটে চলে গেল নিজের বাড়ি। মাকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে বলল যে বাদশাহ ঐসব মজা করার জন্য করেছিলেন। আবুল তার মাকে কথা দিল, প্রত্যেক দিন সে এসে মাকে দেখে যাবে। ক্রমে সারা দেশে আবুল হোসেনের বিচিত্র কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল। বাদশাহের অনুচরের পদে নিযুক্ত হয়েও লোকের প্রতি আবুলের ব্যবহারে কোন পরিবর্তন দেখা দিল না। কোন দেমাগ নেই তার, সবার সাথেই মেশে, কথা বলে। বাদশাহকেও আবুল হাসিয়ে মারে। শেষে এমন হয়ে গেল যে আবুলকে ছেড়ে বাদশাহ থাকতে পারতেন না। তাঁর ভাল লাগত না।

অন্দর মহলে আবুলের অবাধ যাতা-যাত ছিল। গন্নার দিকে তার তাকানো, গন্নার লজ্জা পাওয়া, গন্নাকে দেখে

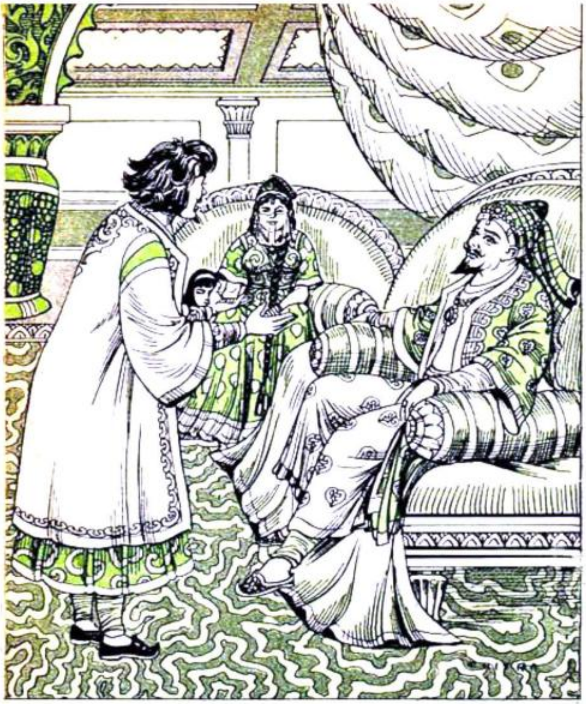

আবুলের খুশী খুশী ভাব—এসব রাণী জুবেদা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি একদিন বাদশাহকে বললেন, "হুজুর, আপনি হয়ত লক্ষ্য করেছেন, গন্না, এবং আবুলের মধ্যে ভালবাসা হয়েছে। এবার ওদের বিয়ের ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করাই ভাল।"

"আমিও তাই ভাবছি। কাজের চাপে আমি সময় করে উঠতে পারছি না। আমি আবুলকে কথা দিয়েছিলাম ওর বিয়ের ব্যবস্থা করে দেব। আচ্ছা গন্নার সাথে ওর কি ভাল মানাবে? তোমার কি মনে হয়?" বাদশাহ বললেন।

একদিন বাদশাহ এবং জুবেদা গন্না ও আবুলকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা দুজনে বিয়ে করবে?"

গন্নার মুখে সলজ্জ আনন্দের ভাব ফুটে উঠল। সে হঠাৎ জুবেদার পায়ে পড়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

আবুল, নীচু গলায় বলল, "আপনার দয়ার সমুদ্রে আমি ভাসছি। যা বলবেন তাতেই রাজী। কিন্তু তার আগে একটি প্রশ্ন করতে চাই রাণীকে।"

"কি প্রশ্ন করতে চাও, কর?" জুবেদা বলল।

"আপনি দয়া করে এই কোমল স্বভাবা মিষ্টি নামধারিণীকে জিজ্ঞাসা করুন আমার রুচির সাথে তার রুচি কি মেলে? আমি ভালবাসি খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান, আর কবিতা। এখন উনিও যদি এসব ভালবাসেন তাহলে মহানন্দে বিয়ে করতে পারি। আর তা না হলে বিয়ে না করেই সারা জীবন কাটিয়ে দিতে চাই।" আবুল বলল।

রাণী জুবেদা গন্নাকে জিজ্ঞেস করলেন, "গন্না, তুমিতো আবুল হোসেনের কথা শুনেছ? বল তোমার কি মত।"

গন্না সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

বাদশাহ তৎক্ষণাৎ কাজীকে ডাকলেন। সাক্ষী দেওয়ার লোককেও ডেকে পাঠালেন। বিয়ের শর্তাবলি লেখানো হল। তিরিশ দিন ধরে রাজ-

প্রাসাদে আনন্দের উৎসব চলেছিল। নব দম্পতি মহানন্দে দিন যাপন করছিল।

আবুল এবং গন্না সারাদিন ধরে খাওয়া দাওয়া আর নাচ গানে মেতে থাকত। আবুলের হাতে যা টাকা পয়সা ছিল তা জলের মত খরচ হতে লাগল। হঠাৎ দেখল তার হাতে আর কাণা-কড়িও নেই। বাদশাহ রাজ-কাজে ডুবে থাকতেন। আবুলের মাসহারার কথা একদম ভুলে গিয়েছিলেন। আবুল এবার ধার দেনা করতে লাগল।

আবুল এবং গন্না ঋণের ভারে নুয়ে পড়েছিল। কিন্তু বাদশাহের কাছে মুখ ফুটে কিছু চাইতে যায়নি। দুশ্চিন্তার কালো ছায়া তাদের গ্রাস করল।

আবুল একদিন বলল, "গন্না সব টাকা পয়সা তো আজে বাজে কাজে খরচ করে ফেলেছি। এবার একটা অন্য উপায়ের কথা ভাবছি।"

গন্না দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করল, "বল কোন্ উপায়ের কথা ভাবছ? পারলে আমিও সাহায্য করব। আমরা এখন কারো কাছে চাইতেও পারি না, নিজেদের চালচলনও বদলাতে পারিনা।

"না, ভাবছি একসাথে মরে গেলে কেমন হয়?" আবুল জিজ্ঞেস করল।

গন্না ভয়ে চমকে উঠে বলল, "ওমা,

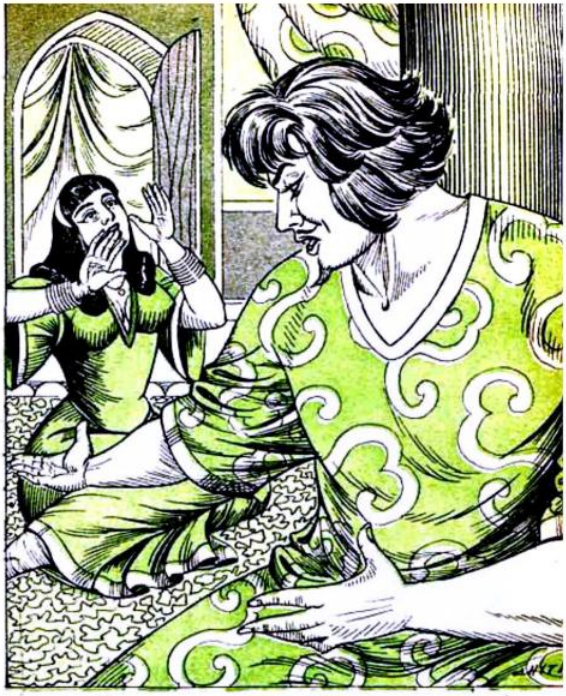

না আমি মরব না। তুমি মরতে চাও মর, আমি তোমাকে সাহায্যও করবনা।"

আবুল গন্নার কথা শুনে বিরক্ত হল না। শান্ত স্বরে বলল, "আরে পাগলী, আমি যখন একাছিলাম, তখনই জানতাম বেঁচে থাকাই জীবনের একমাত্র পথ। এতো আমার জানা কথা। আর এখন, তোমাকে বিয়ে করার পরে, ভাবছি, আহা আমি একা একা কি সুখেই না ছিলাম! তোমার বুদ্ধি বড় মোটা। মরার কথা বলতেই ভয়ে কাঁপছ। ভুল বকছ। আমি ভেবে চিন্তে একটা উপায় বলতে যাচ্ছি-লাম। আমি যে ভাবে মরার কথা বল-ছিলাম সেটা শুনলে, তুমি খুব খুশী

হতে। হেসে খুন হতে। মরা মানে সত্যি সত্যি মরে যাওয়া নয়। মরার অভিনয় ভালভাবে করতে পারলে আমাদের মাথায় সোনার বৃষ্টি হবে।"

গন্না হেসে বলল, "তা কি করে সম্ভব ?"

"শোন, আমার মারা যাবার পর আমাকে একটা ঘরে শুইয়ে দাও। যেদিকে মক্কার কাবে আছে সেদিকে মাথা দিয়ে শোওয়াবে। আমার মাথার পাগ্ড়ি আমার শরীরের উপর রেখে দেবে। তার পর বুক ফাটিয়ে কাঁদবে। কাপড় ছেঁড়ার, মাথার চুল ধরে কষে টানার অভিনয় করবে। এই সব করার পর তুমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তোমাকে ঘিরে যখন অনেক লোক জমে যাবে, তখন তুমি কাঁদতে কাঁদতে পাগলের মত রাণী জুবেদার কাছে ছুটে যাবে। ওখানে কাঁদতে কাঁদতে মূর্ছা যাবে। জ্ঞান হবার পর আমার মৃত্যু সংবাদ দেবে। তারপর আবার মেঝেতে পড়ে যাবে। ঐভাবে পড়ে থাকবে। অনেক লোক জমে যাবে। চারদিক থেকে লোক এসে সাহায্য করবে। আমার মৃতদেহ ঘিরে টাকা পয়সা পড়তে থাকবে। সোনার বৃষ্টি হবে।" আবুল হোসেন বলল।

"তুমি মরার অভিনয় করবে ? তাহলে আমি সাহায্য করতে পারি। তবে যে তুমি বললে এক সাথে মরতে হবে ? আমি মরব কি ভাবে ?" গন্না জিজ্ঞেস

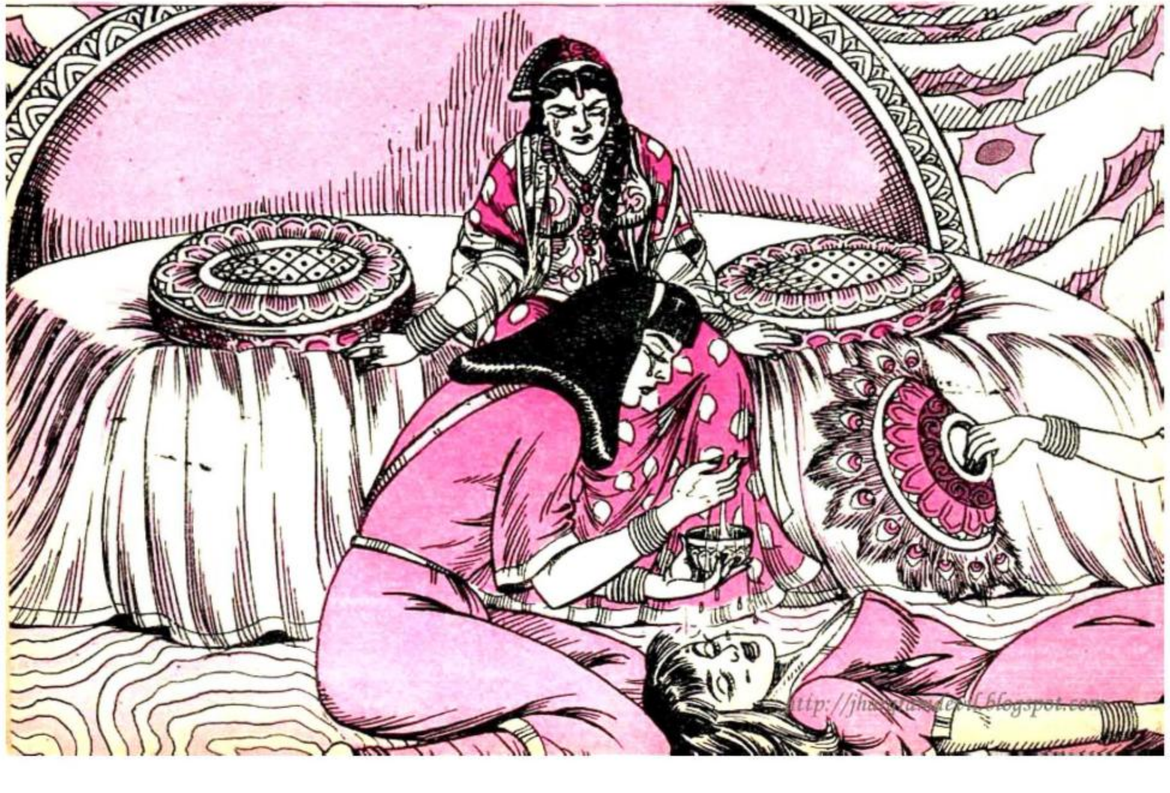

করল।

"আরে ওসব আল্লার কাজ। তুমি কবে মরবে তা আমি কি করে বলব ? নাও, তৈরি হও। এবার আমি মরছি। যা বললাম সব ঠিক মত করবে। মরছি। মরে গেলাম।" আবুল শুয়ে পড়ল।

গন্না আবুল হোসেনের কাপড় খুলে নিয়ে মড়া ঢাকার কাপড় দিয়ে আবুলকে মুড়ে দিল। নিজের গায়ের কাপড় ছিঁড়ে মাথার চুল এলোমেলো করে পাগলের মত ছুটে গেল রাণী জুবেদার কাছে। হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগল।

গন্নার অবস্থা দেখেই রাণী জুবেদা অনুমান করে নিলেন গন্নার নিশ্চয় কোন বড় ধরনের বিপদ ঘটেগেছে। ততক্ষণে গন্না অজ্ঞান হয়ে গেল। রাণী গন্নার মাথা নিজের কোলে রেখে তার জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। তারপর অল্প অল্প জ্ঞান আসার পর থেমে থেমে গন্না জানাল যে তার স্বামীর কাল রাত্রে বদহজম হয়েছিল এবং সে মারা গেছে। এসব কথা বলে শেষে গন্না বলল, "এখন মরণ ছাড়া আমার সামনে আর কোন পথ নেই। আমি মরতে চাই। আল্লা, আমাকে মেরে ফেল। গন্না আবার অজ্ঞান হয়ে গেল।

সেখানে যে সব মেয়েরা জড় হয়ে ছিল তারা সবাই কাঁদতে লাগল। গন্না আর তার স্বামী আবুল হোসেন যে কত ভাল

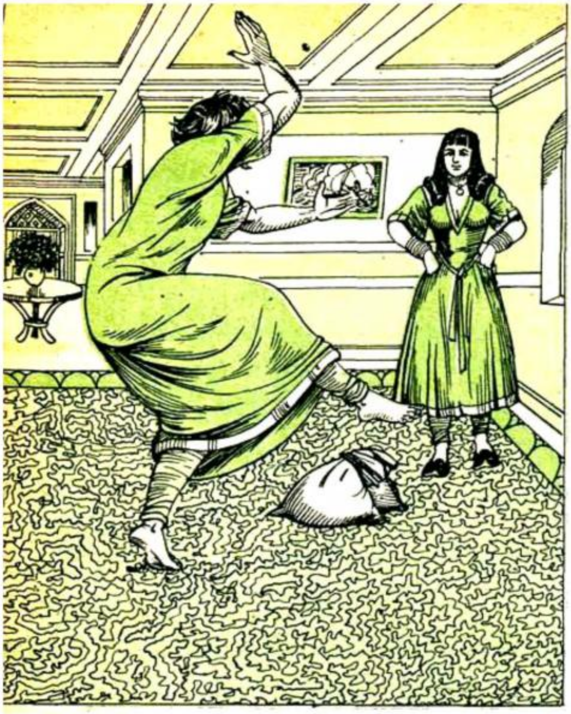

ছিল, কত আনন্দে ছিল, অন্যদের কত আনন্দ দিত প্রভৃতি কথা বলে সবাই কাঁদতে লাগল। তারপর গন্নাকে রীতি অনুসারে গোলাপ জলে স্নান করাল।

জুবেদা অনেকক্ষণ কাঁদলেন। তারপর নিজের খাজাঞ্চীকে ডেকে বললেন, "আমার খাজনা থেকে দশ হাজার দিনার গন্নার ঘরে দিয়ে এস। তার স্বামীর কাজকর্ম যেন ভালভাবে করা হয়।"

খাজাঞ্চী দশ হাজার দিনারের থলি একজনের পিঠে চাপিয়ে দিয়ে আবুল হোসেনের ঘরে পেঁাছে দিল।

তারপর জুবেদা গন্নার গলা জড়িয়ে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলল, "আল্লাহ, তোমার দুঃখ দূর করুক! তুমি তোমার স্বামীর আয়ু নিয়ে চিরকাল বেঁচে থাক!"

গন্না জুবেদার হাত দুটো দিয়ে নিজের চোখের জল মুছে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

ঘরে ঢুকেই গন্না খুশীর মেজাজে বলল, "এই যে ও ভাঁড় মশাই, এবার উঠুন। যা রোজগার করার করা গেছে। এবার বেঁচে উঠুন।"

আবুল হোসেন ঢাকা কাপড় সরিয়ে উঠে পড়ল। গন্নার সাহায্যে আবুল ঐ দিনারের থলি ঘরের মধ্যে টেনে আনল। ঐ থলির চারিদিকে এক পায়ে কয়েকবার চক্কর কেটে নিল আবুল।

তারপর গন্নাকে অভিনন্দন জানিয়ে আবুল বলল, "এখনও পুরো খেলা শেষ হয়নি। এবার তোমার পালা। এবার তোমাকে মরতে হবে। তবে তুমি যতটা নিপুণতার সাথে অভিনয় করে রাণী জুবেদার কাছ থেকে এই দশ হাজার দিনার আনতে পারলে আমি বাদশাহের কাছে ততটা পাকা অভিনয় করতে পারব কি না সন্দেহ। তবু আমি বাদশাহকে বুঝিয়ে দিতে চাই যে অভিনয় শুধু তিনি-ই পারেন না, অন্যেরাও পারে।"

"তারপর আর কি আবুল নিজেকে যে কাপড়ে গুটিয়ে রেখে ছিল সেই

কাপড়ে গন্নাকে জড়িয়ে দিল। আবুল কাঁদতে পারছে না। কি করবে। পেঁয়াজ চোখে ঘষে নিল। চোখ জলে ভরে গেল। নিজের গায়ের জামা ছিঁড়ে নিল। চুল এলো মেলো করে নিল। ছুটে গেল আবুল বাদশাহের কাছে।

যে আবুল হোসেনকে সব সময় হাসি খুশী দেখেন তার কান্না-কান্না ভাব দেখে বাদশাহ তো অবাক। কেমন যেন ঘাবড়ে গেলেন তিনি। বাদশাহ আবুলের কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কিছু হয়েছে কিনা। আবুল বুক চাপড়ে কেঁদে ককিয়ে বলল, "আহ, আমার গন্না! আমাকে একি করলে!" এ কথা বলে জামা দিয়ে চোখ ঢেকে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে কি যেন বলে কাঁদতে লাগল।

বাদশাহ বিচলিত হয়ে গন্নার মৃত্যুর কথা শোনার আশঙ্কা করলেন। নিজের চোখের জল মুছে বাদশাহ বললেন, "ভাই, গন্না কি তাহলে···আর নেই।"

আবুল মাথা নেড়ে বাদশাহের কথায় সায় দিল। তারপর বাদশাহ বললেন, "আল্লা তোমাকে গন্নার আয়ু দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবেন। আমি তার সাথে তোমার বিয়ে দিয়ে ভেবে ছিলাম সে তোমাকে আনন্দের সাগরে ডুবিয়ে দেবে। কিন্তু আজ সে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে!" বাদশাহের কাছে অন্য যারা ছিল তারাও কাঁদতে লাগল।

তারপর, বাদশাহ নিজের খাজাঞ্চীকে

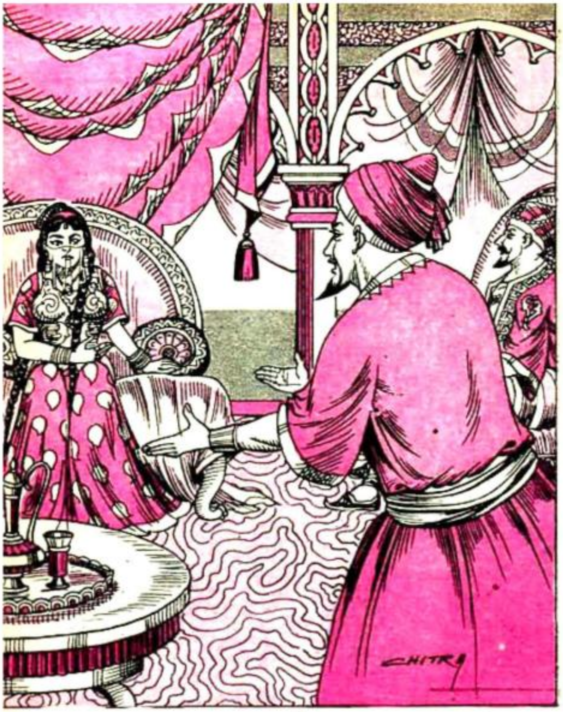

ডেকে বললেন, এই আবুলের সাথে দশ হাজার দিনার পাঠিয়ে দাও। এ বেচারার বউ মরে গেছে। কাজকর্ম ভাল ভাবে খরচ করে করতে দাও। খাজাঞ্চী দশ হাজার দিনার আনতে চলে গেল। আবুল বাদশাহের দুই হাতে নিজের সজল চোখ মুছে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। ঘরে ফিরে এসে দেখে গন্না কাঠ হয়ে পড়ে আছে। আবুল গন্নার দিকে তাকিয়ে বলল, "কি, খুবতো ভেবে ছিলে চোখের জল দেখিয়ে রোজগার করার কায়দা একমাত্র তুমি-ই জান। একবার এই থলিটার দিকে তাকাও।" বলতে বলতে আবুল গন্নার কাপড় সরিয়ে দিয়ে আবার বলল, "ওঠ। এখনও আমাদের খেলা শেষ হয়নি। এবার ভাবতে হবে অন্য কথা। রাণী জুবেদা আর বাদশাহের রাগতো হবে আমাদের উপর। তখন বাঁচব কি করে?" তখন কি করতে হবে গন্নাকে আবুল বুঝিয়ে দিল।

বাদশাহ সেদিন দরবারের সবাইকে ফিরে যেতে বলে নিজে জুবেদার কাছে চলে গেলেন। জুবেদাও মনমরা ছিলেন। জুবেদা এমন সব কাণ্ড করছিলেন যেন বাদশাহ তার প্রিয়পাত্র আবুল হোসেনকে একেবারে হারিয়েছেন।

বাদশাহ সেই দুঃখের মধ্যেও হেসে মনশূরকে বললেন, "রাণী ভুল খবর পেয়েছেন। তাঁর ভুল ভেঙ্গে দাও।"

মনশূর রাণী জুবেদাকে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাণী, আবুল হোসেনের কিছু হয়নি। দুঃখ পেলে যা হয় তাই হয়েছে। স্ত্রী মারা গেলে দুঃখ হওয়াই তো স্বাভাবিক। বাদশাহ দশ হাজার দিনার গন্নার কাজের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

জুবেদা বললেন, "আমার খাজাঞ্চীকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন আবুল হোসেনের শেষ কাজের জন্য খাজনা থেকে আমি কত দিনার দিয়েছি।"

বাদশাহ এবং বেগমের মধ্যে কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি হল। বাদশাহ বলছিলেন

গন্না মারা গেছে আর বেগম বলছিলেন আবুল হোসেন মারা গেছে। শেষে বাদশাহ মনশূরকে আদেশ দিলেন, "তুমি আবুল হোসেনের ঘরে গিয়ে দেখতো কে মারা গেছে।"

গন্না মারা গেছে বলে বাদশাহ বেগমের সাথে বাজী রাখলেন।

আবুল হোসেন গন্নাকে বলল, "গন্না, মনশূর! তুমি তাড়াতাড়ি মরে যাও।"

গন্না হাত পা টান করে শুয়ে পড়ে রইল। চোখ মুখ কাপড়ে ঢেকে পাশে বসে আবুল হোসেন কাঁদতে লাগল।

বাদশাহের কাছে গিয়ে মনশূর বলল, "বেগমেরই ভুল হয়েছে। আবুল হোসেন বেঁচে আছে। গন্নাই মারা গেছে।"

বাদশাহ খুশী হয়ে বললেন, "বেগম তুমি বাজীতে হেরে গেছ।"

বেগম জুবেদা অস্বীকার করে বললেন, "মনশূর মিথ্যা কথা বলতে পারে। লোক পাঠিয়ে প্রমাণ করে দিচ্ছি যে গন্না বেঁচে আছে। আমার কথা সত্য প্রমাণিত হলে মনশূরের গলা কেটে ফেলতে হবে।"

আবুল অপেক্ষা করছিল এবার কে আসবে দেখার জন্য। জুবেদার দাসীকে দূর থেকে আসতে দেখে সে চিৎকার করে উঠল, "গন্না, এবার আমি মরছি।"

দাসী যা দেখল বেগমকে তা বলল। তৎক্ষণাৎ বেগম জুবেদা জয়ী হওয়ার আনন্দে নেচে উঠে মনশূরের গলা কেটে দিতে বাদশাহকে বললেন।

"মনশূরের কথা মিথ্যা হলে তো আমার কথাও মিথ্যা হয়ে যাবে। সব-

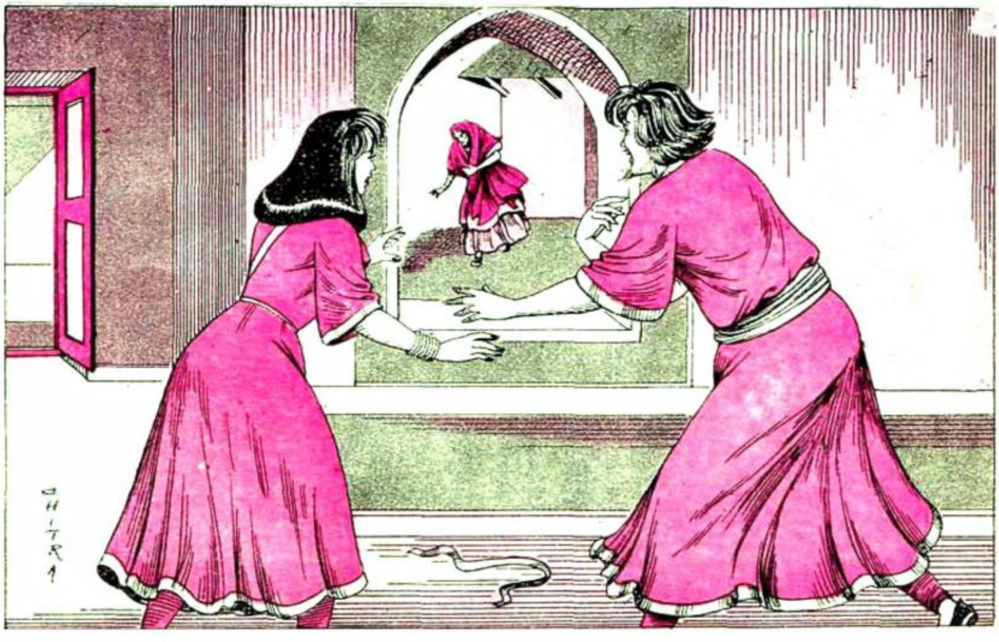

চেয়ে ভাল হবে আমরা দুজনে একসাথে গিয়ে যদি দেখে আসি। তৈরি হও। যাওয়া যাক।" বাদশাহ বললেন।

দূর থেকে বাদশাহ ও বেগমসহ অনেককে দেখে আবুল বলল, "গন্না, এবার দুজনকেই যে মরতে হবে।"

বেগম ও বাদশাহ আবুল হোসেনের ঘরে এসে দেখে দুজনেই মরে আছে।

বেগম জুবেদা বললেন, "কিন্তু কে যে আগে মরেছে তা জানব কি করে?" বাদশাহ বললেন, "যে জানাবে তাকে আমি দশ হাজার দিনার উপহার দেব।"

"জাঁহাপনা আমাকে দিয়ে দিন। আমি আগে মরে ছিলাম।" ঢাকা কাপড় সরিয়ে আবুল বলল।

বেগম জুবেদা ও বাদশাহ হারুণ-অল-রশীদের সাথে আরো অনেকে এল।

আবুল হোসেনের মনে এই ধরনের ঘটনা যে ঘটবে তা আগে সাড়া দিয়ে ছিল।

মড়াকে কথা বলতে দেখে বেগম জুবেদা রীতিমত ঘাবড়ে যায়। ইতিমধ্যে বাদশাহ আসল ব্যাপার যে কী হতে পারে তা অনুমান করে বলে ওঠেন, "আবুল হোসেন, ঢের হয়েছে। এবার ওঠ। আর হাসতে পারছি না। এবার আমাকেই মারা পড়তে হবে।"

বাদশাহের কথা শুনে উঠে আবুল বাদশাহের এবং গন্না জুবেদার পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইল।

আবুল হোসেন বাদশাহকে বলল, "হুজুর, যতদিন অবিবাহিত ছিলাম তত-দিন টাকার ব্যাপারে মাথা ঘামাইনি। কিন্তু এই গন্না থলি থলি সোনা, খাজনা এবং খাজাঞ্চীকেও গিলে ফেলবে।"

আবুলের কথা শুনে বাদশাহ ও বেগম আবুল ও গন্নাকে ক্ষমা করে প্রত্যেককে আরও দশ হাজার করে দিনার দিলেন।

আর কোনদিন আবুলের যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য জাফরের সমান বেতনের ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর থেকে মহানন্দে তারা বাকী জীবন কাটিয়ে দিল। (শেষ)

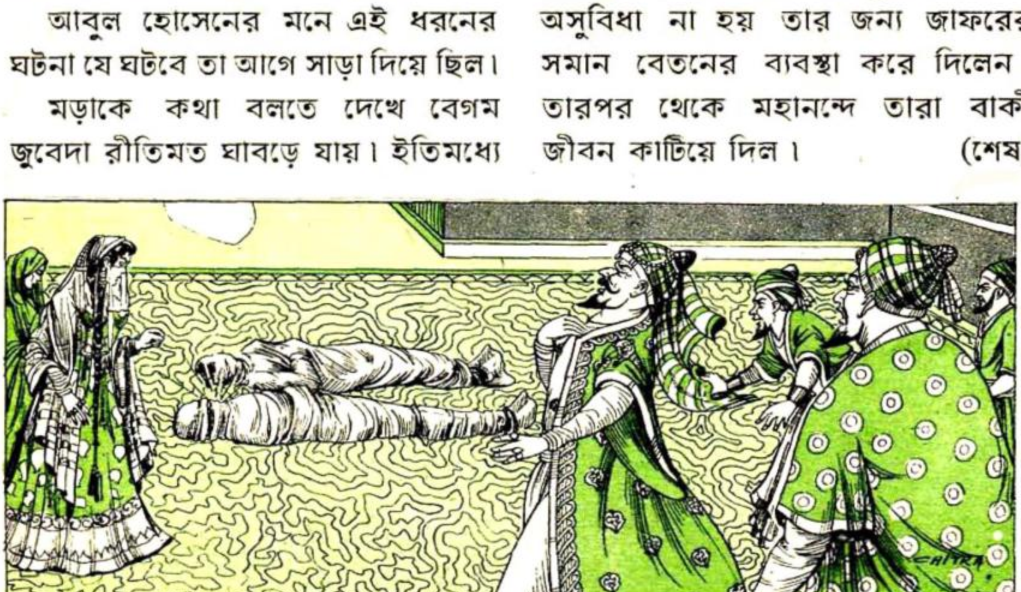

সোনার পাখি

সুন্দর বনের এক বিরাট আম গাছে এক পেঁচা বসে ছিল। জ্যোৎস্না রাতে জঙ্গলের শোভা খোশ মেজাজে দেখছিল পেঁচা। ঠিক তখনই তার কানে গেল গোঙানী। নীচে তাকিয়ে দেখে এক মস্ত বড় সাপ। সাপের মুখে পাখির ডিম। সাপ ঐ ডিম মুখে করে এনে গাছের উপরে উঠল। একটি পাখির নীড়ে সেই ডিম রেখে নিজের পথে চলে গেল।

সকালে পেঁচা ঐ নীড়ে দেখতে পেল এক ছোট্ট সদ্যজাত পাখি। তার গায়ে সোনার আভা। তার গা দিয়ে যেন সোনা ঝরে পড়ছে।

ঐ পাখির উপর পেঁচার সহানুভূতি জাগল। পেঁচা ঐ পাখির ছানা এনে নিজের নীড়ে রাখল। লালন পালন করল স্নেহ আদরে। দু মাসের মধ্যে ঐ ছানা সুন্দর সোনার পাখিতে পরিণত হল।

সোনার পাখিটিকে বিয়ে করতে বনের সমস্ত পাখি ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু পাখিটি রাজী হ'ল না।

সুন্দর বনের পাখিদের রাজা ছিল দুটো মাথার এক বিচিত্র পাখি। তার রাণী ময়ূরী ছিল ভীষণ দেমাগী। নিজের রূপের অহঙ্কার ছিল তার। সোনার পাখির রূপের বাহারের কথা কানে যেতেই তার প্রতি ময়ূরীর ভীষণ ঈর্ষা জাগল। নিজে নানান ধরণের নকল জিনিস পরে সেজে গেল সেই সোনার পাখির কাছে।

তাকে দেখেই সোনার পাখি হেসে উঠল। ওর হাসি দেখে ময়ূরীর রাগ আরও বেড়ে গেল। রাণী ময়ূরী আদেশ জারী করল কালো কাকের সাথে যেন সোনার পাখির বিয়ে দেওয়া হয়। এই আদেশ বলে সোনার পাখির সাথে কালো

এ. সি. সরকার (জাদুকর)

কাকের বিয়ে হল। ওরা দুজনে একটি গাছে ঘর সংসার করছিল।

এত করেও রাণী ময়ূরীর যেন রাগ পড়ল না। ওর ধারণা হল কাক আর সোনার পাখি নিশ্চয় খুব সুখে ঘর সংসার করছে। ওদের এত শান্তিতে বাস করতে দেওয়া যায় না। ওদের ঘর ভাঙ্গাতে হবে। রাণী এসব কথা ভেবে শেষে নিজের স্বামীকে বলল, "রাজা, তুমি দিনকে-দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছ। এভাবে চললে তুমি তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাবে। আর বুড়ো হয়ে গেলে রাজত্ব চালাবে কি করে? তুমি যদি প্রত্যেক দিন একটা করে সোনার ডিম খেতে পার তাহলে তোমার যৌবন অটুট থাকবে। তুমি লোক পাঠিয়ে সোনার পাখীর নীড় পাহারা দিতে বল। ডিমগুলো তোমার লোক তুলে আনবে। তুমি খেতে পারবে।"

রাজা লোক পাঠিয়ে দিলেন সোনার পাখির বাসা পাহারা দিতে। ঐ নীড় থেকে ডিম আনতে রাজার লোক চলে গেল।

রাজার আদেশের কথা শুনে সোনার পাখি রাজার লোককে বাধা দিল না। সোনার পাখি ভেবেছিল স্বামী সহ সে অন্য কোন বনে পালাবে। কিন্তু পালানো সম্ভব হল না। সোনার পাখির নীড়কে ঘিরে রয়েছে পঞ্চাশটা বাজ পাখি।

একদিন পেঁচা সোনার পাখিটিকে

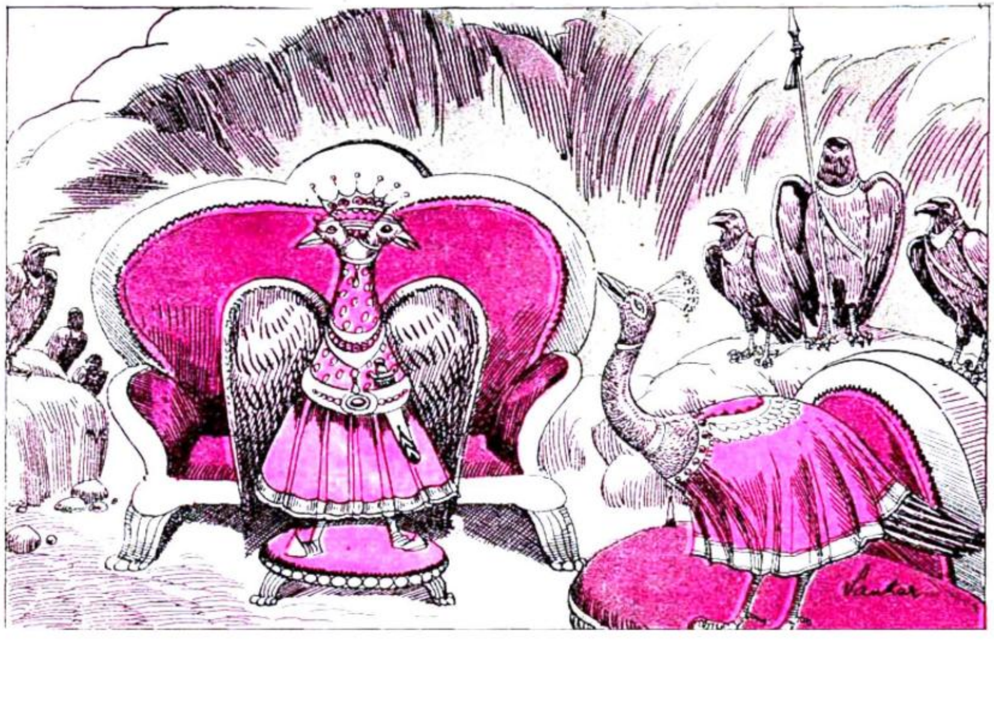

দেখতে এসে সমস্ত ব্যাপার জানতে পারল। সব কথা শুনে পেঁচা সোনার পাখিকে কথা দিল একটা কিছু উপায় সে বের করবে।

পাখি চিকিৎসার জ্ঞান পেঁচার ছিল। রাজার চিকিৎসা করে অতীতে সে রাজার প্রশংসা পেয়েছিল। পেঁচা ভাবল রাণী কাছে থাকলে সে রাজার মন পরিবর্তন করতে পারবে না। তাই ময়ূরী-রাণীকে দূরে কোথাও পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

এই কাজ করার উদ্দেশ্যে পেঁচা অন্য বনে চলে গেল। সেই বনে ছিল রাণী ময়ূরীর বাবা-মা। পেঁচা রাণীর বাবা-মাকে ঘটা করে নিমন্ত্রণ করল। খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে রাণীর বাবা-মাকে সে খাওয়াল। ফলে রাণীর বাবা-মা অসুখে পড়ে গেল।

রাণী-ময়ূরী তার বাবা-মার অসুখে পড়ার খবর জানতে পারল। রাণী-ময়ূরী রাজার অনুমতী নিয়ে বাবা-মাকে দেখতে গেল। পরের দিন সকালেই পেঁচা সোজা রাজার কাছে গেল। গিয়েই দেখে রাজা সোনার পাখির ডিম খেতে যাচ্ছেন।

"মহারাজ, তাড়াহুড়ো করে আপনি ঐ সোনার ডিম খেতে যাবেন না। ঐ ডিম তাজা ডিম নয়। বাসি পচা ডিম হতে পারে ওটা।" পেঁচা বলল।

"এই ডিম তো কাল রাত্রের দেয়া।" রাজা জবাবে বলল।

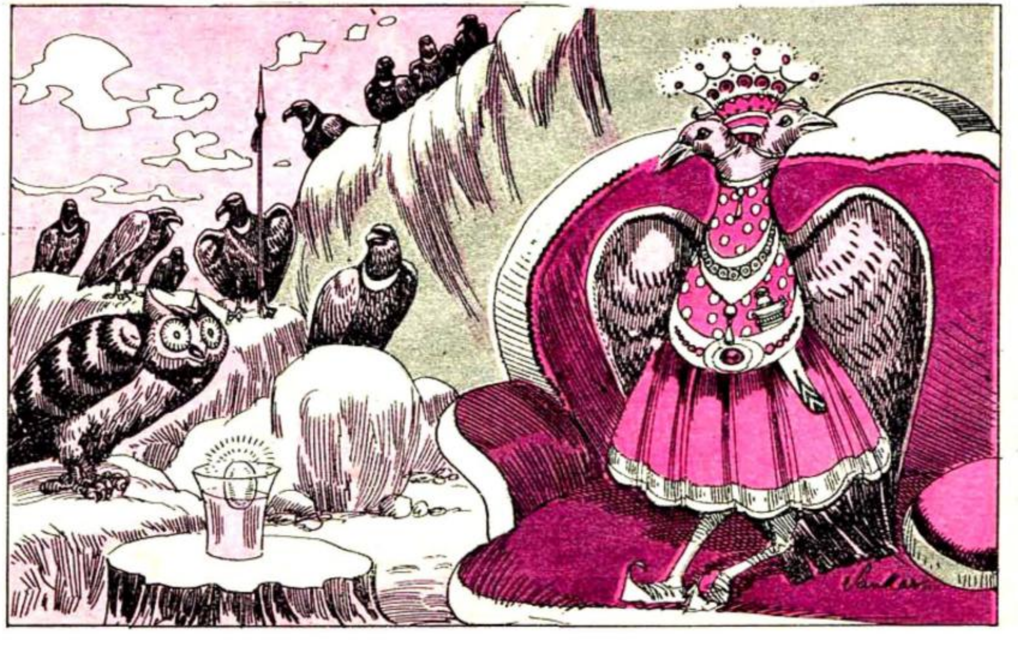

"পরীক্ষা করে দেখুন। জল ভর্তি এই পাত্রে ডিমটা ফেলে দিন। তাজা ডিম হলে জলে ডুবে যাবে। আর পচা ডিম হলে জলে ভেসে উঠবে।" পেঁচা যেন বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলল।

"তাতো আমিও জানি।" এই কথা বলে রাজা ঐ ডিম পেঁচা যে জলের পাত্রে ঢালতে বলেছিল সেই পাত্রে ঢেলে দিল। সেই ডিম জলে ডুবল না, ভেসে উঠল।

"তোমার কথাই সত্য হল দেখছি। এটাকে নিয়ে গিয়ে ফেলে দাও।" পাখি-দের রাজা বলল। পেঁচা ঐ ডিম নিয়ে গিয়ে সোনার পাখিকে দিল। সে খুব খুশী হয়ে বলল, "এটাকে তুমি বাঁচালে কি করে?"

পেঁচা হেসে জবাব দিল, "আমি এক কৌশল করেছি। এই কৌশল আমি এক ছেলের কাছে শিখে ছিলাম। কৌশলটা হল, এমনি জলে ছেলেটা ডিম ছেড়ে দিত। ডিম ডুবে যেত। তারপর সেই ডিম তুলে নিত। ঐ জলে অনেক নুন ঢেলে দিত। তখন এমন ভাব করত যেন মন্ত্র পড়ছে। তারপর ঐ ডিম ঐ লবণাক্ত জলে ঢেলে দিত। ডিম ভাসত। আমিও পাখির রাজার কাছে একই কৌশল খাটিয়েছি। ডিম যথারীতি ভেসে উঠেছিল। রাজা বিশ্বাস করলেন যে ডিম পচা।"

সেই ডিম সোনার পাখির বাসায় রাখা বিপদজনক ছিল। সেই জন্য পেঁচা সেই ডিমটাকে নিজের নীড়ে নিয়ে গেল। সেখানে তা দিয়ে ডিম ফোটাল। এক রাত্রে ঐ সোনার পাখির ছানা নিয়ে অন্য বনে চলে গেল ঐ পেঁচা।

রাণী-ময়ূরী মা-বাবাকে দেখে ফির-ছিল। তখন কোন এক শিকারী তাকে তীর বিদ্ধ করে মেরে ফেলল। তার কিছুদিন পরে পাখির রাজাও মারা গেল। তারপর থেকে সোনার পাখি এবং কাক সুখে দিন যাপন করছিল। তারা চলে গেল সেই বনে যেখানে পেঁচার আশ্রয়ে তাদের ছানা ছিল। ওরা সেখানেই সুখে দিন কাটাচ্ছিল।

হাতীর পঞ্চায়েত

আফ্রিকার এক বড় সরোবরের তীরে রামোগী নামে এক বুড়ো বাস করত। সাত ছেলে আর বউদের নিয়ে বুড়োর সংসার। কালে তার নাতিনাতনীদের নিয়ে সেই অঞ্চল একটা ছোটখাট গ্রামে পরিণত হয়েছিল।

রামোগীর মারা যাবার পর সেই অঞ্চলের অধিকার রামোগীর বড় ছেলের হয়ে গেল। ফলে অন্য ছেলেরা সপরিবারে অন্যান্য জায়গায় বসবাসের ব্যবস্থা করতে লাগল।

তাদের মধ্যে শেষ দুই ভায়ের খুব মিল ছিল। পোধু এবং অরুবা। কোনদিন একজনকে ছেড়ে অন্যজন থাকতে পারত না। তারা বাচ্চা বয়স থেকে এক সাথে খেলত, খেত, ঘুমোত। বড় হয়ে ওরা দুজনে দুই বোনকে বিয়ে করল।

এইসব কারণে ওরা কোন এক জায়গায় একসাথে থাকবে ঠিক করল। এইভাবে দুই ভাই একত্রে থাকা রীতি বিরুদ্ধ। কিন্তু তারা প্রচলিত রীতি ভঙ্গ করল।

তারপর তাদের ভাবনা হল কোথায় তারা থাকবে। রামোগীর আস্তানা যেখানে ছিল তার পূব দিকে বিরাট গভীর এক অরণ্য ছিল। ওরা দুই ভাই ঠিক করল ঐ পূবের অরণ্যেই বসবাস করবে। চাষআবাদ করবে।

ওরা খুব সাহসের সাথে ঐ অরণ্যে থাকার সিদ্ধান্ত নিল। কারণ ঐ অরণ্যে হাতী ছিল অনেক। আর অরণ্যটা ছিল গভীর ও ভয়ঙ্কর। ঐ অরণ্যে যারা ঢুকত তারা হয় গিরগিটি অথবা অন্য কোন জন্তু হয়ে যেত। লোকের ধারণা ঐ অরণ্যের হাতীগুলো মন্ত্র জানে।

এহেন অরণ্যে পোধু ও আরুবা ঘর

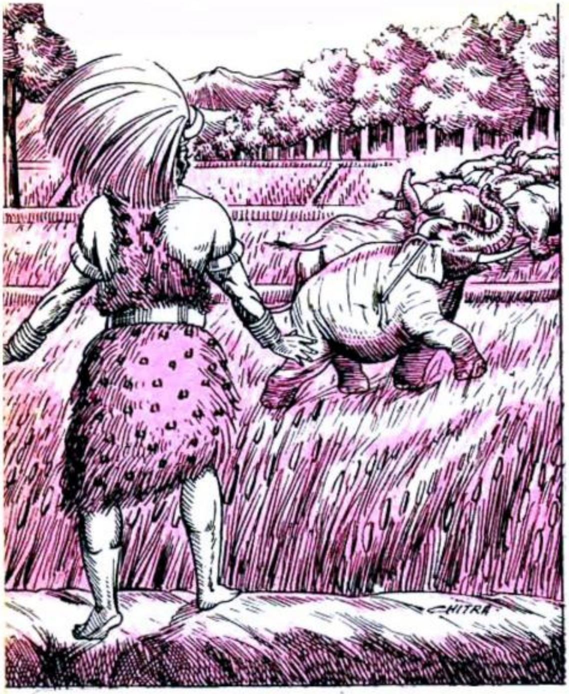

বেঁধে থাকতে শুরু করে দিল। যবের চাষ করতে লাগল।

একদিন আরুবা মোষ-গরু হাঁকতে হাঁকতে বাইরে চলে গেল। পোধু বাড়ি-তেই ছিল। হঠাৎ সে বাচ্চাদের আর্তনাদ শুনতে পেল, "হাতী এসেছে। হাতী এসেছে!" পোধু বল্লম নিয়ে এল।

পোধু দেখল হাতীর দল শুঁড় দিয়ে বাড়ন্ত যব গাছগুলো উপড়ে ফেলছে। পোধু গর্জে উঠল। সাথে সাথে বহু হাতী পোধুর দিকে ধেয়ে এল।

এতগুলো হাতীকে নিজের দিকে ধেয়ে আসতে দেখে পোধু হাতের বল্লমটিকে ঐ হাতীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় হাতীর দিকে ছুঁড়ে দিল। সেই বল্লম সোজা হাতীর বগলে ঢুকে গেল। হাতী আর্ত-নাদ করে ফিরে যেতে লাগল। তার যাওয়ার সাথে সাথে অন্য হাতীরাও পরামর্শ করে ফিরে যেতে লাগল।

এই ঘটনার ফলে পোধু এক মারাত্মক অপরাধ করে ফেলল। সেই বল্লমটি সাধারণ বল্লম ছিল না। রামোগী বংশের সেই বল্লম ছিল বহু পুরুষের। কথিত আছে যে কোন এক যুগে নন্দো বংশের লোক ঐ বল্লম তৈরি করেছিল। রামোগী কিন্তু কোন দিন ঐ বল্লম প্রয়োগ করেনি। যত্নে রেখে দিয়েছিল। আরুবা ঐ বল্লম-টাকে জীবনের চেয়ে বেশি ভালবাসত। তাড়াহুড়ো করে পোধু ঐ বল্লম তুলে এনে হাতীর উপর ছুঁড়ে দিয়ে ছিল। আর বল্লম-বিদ্ধ হাতী ঐ বল্লমসহ গভীর অরণ্যে ঢুকে গেল।

অরুবা বাড়ি ফিরে বল্লম যে কিভাবে হারিয়ে গেছে তা জানতে পারল। রেগে গিয়ে সে পোধুকে বলল, "আমার বল্লম আমাকে ফেরত দাও।"

"আরুবা তোমার বল্লম হাতীর সাথে ভয়ঙ্কর গভীর অরণ্যে চলে গেছে। ঐ বল্লম আনা যাবে কি করে! তার পরি-বর্তে আমি তোমাকে ভাল একটা বল্লম কিনে দেব।" পোধু সবিনয়ে বলল।

"আমি আমার ঐ বল্লমটাই চাই। ওটা তুমি না এনে দিলে, তোমাকে আমি মেরে ফেলব।" অরুবা বলল।

"ঠিক আছে। হয় আমি তোমার বল্লম এনে তোমার হাতে দেব আর না হয় তোমার বল্লম আনার চেষ্টা করতে করতে মরব।" পোধু বলল।

পরের দিন ভোরে উঠে পোধু রওনা হল। সাথে নিল একটা বল্লম আর একটা চামড়ার থলি। অরণ্যের গভীরে শীত ছিল বেশি। অন্ধকারও ছিল ঘন।

সন্ধ্যা হতেই আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এত ঘন অন্ধকার যে এক পা-ও এগোতে পারছে না। তখন বাধ্য হয়ে এক বিরাট গাছের নীচে বসে পড়ল পোধু। ঐ গাছের খোপরে পোধু আশ্রয় নিল। যবের রুটি খেয়ে নিল। পরের দিন সকালে আবার বেরিয়ে পড়ল। হাঁটছে তো হাঁটছেই। একটাও হাতীর পাত্তা নেই। অনেক দূর হাঁটার পর একটা ফাঁকা জায়গা দেখতে পেল। সেখানে কোন গাছ নেই। অন্ধকার নেই। আলো আছে। ওখানে একটি কুটির আছে। কুটির থেকে ধোঁয়া আসছে।

পোধু হঠাৎ দেখতে পেল ঐ কুটির থেকে বুড়ি কুড়ুল নিয়ে বেরিয়ে এল। কাঠ চিরতে চিরতে বুড়ি আপন মনে

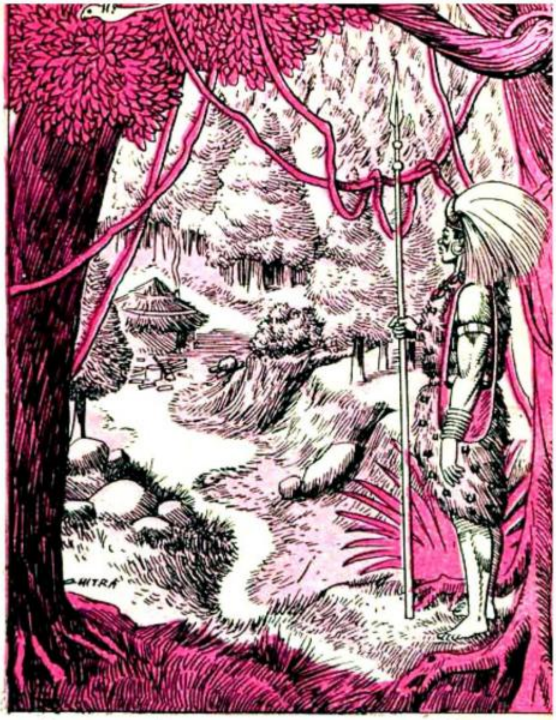

বলছিল "এই বুড়ো বয়সে আর পারি! নিজের বলতে কেউ নেই।"

পোধু তার কাছে গিয়ে বলল, "আমি কাঠ চিরে দেব মা?" বলতে বলতে তার হাত থেকে কুঠার নিয়ে অনেক কাঠ চিরল।

বুড়ি হো হো করে হাসতে হাসতে বলল, "তুমি বাবা খুব ভাল ছেলে। তোমাকে দেখে অবাক হচ্ছি। এখানে, এই বনে ঢুকলে কোন্ দুঃখে?" পোধু নিজের কাহিনী আগাগোড়া বলল।

সব কথা শুনে বুড়ি বলল, "তোমার এখানে এভাবে আসা মারাত্মক কাজ হয়েছে। এত সাহস তোমার! তোমাকে

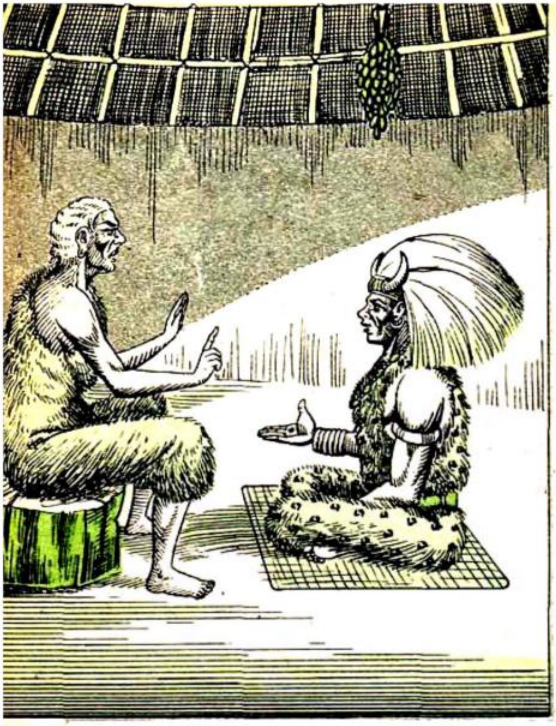

কোন রকম সাহায্য করতে পারব কিনা পরে জানাব। এক্ষুণি কিছুই বলতে পারছি না বাবা। এখন তুমি আমার কাছে থেকে যাও। আমার কাঠ চের।"

পোধু একমাস ধরে ঐ বুড়ির কাছে রয়ে গেল। সারা দিন কাঠ কাটত। বুড়িটা কিছু না কিছু বলত। মাঝে মাঝে বলত, "অকম্মার ঢেঁকি!"

পোধু মনে মনে তখন ভাবল বুড়ি হয়ত তাকে কোন সাহায্য করতে পারবে না। সে কেমন নিরাশ হতে লাগল। পোধুর যখন মনের অবস্থা এই রকম তখন বুড়ি তার পাশে বসে তাকে বলল, "বাবা, আমার কাছে এতদিন তোমার থাকা বৃথা হয়েছে ভেব না। সাহস, সহনশীলতা আর ভাল মানুষী এই তিনটে গুণ না থাকলে হাতীর কাছ থেকে কোন কাজ হাসিল করা যায় না। তোমার মধ্যে এই তিনটে গুণ আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখছিলাম। তুমি একটা হাতীর ভীষণ ক্ষতি করেছ। হাতী অপকারীকে কোনদিন ভোলে না। সেইজন্য তোমার উপকারের জন্য আমি একটা জিনিস দেব।" বুড়ি তার হাতে একটা নীল রঙের পুঁতি দিল।

পরের দিন সকালে পোধুকে একটা রাস্তা দেখিয়ে দিল বুড়ি। ঐ রাস্তা দিয়ে গেলে পোধু হাতীরা যেখানে আছে সেই অঞ্চলে যেতে পারবে।

বুড়ি যে পথ দেখিয়ে ছিল সেই পথ ধরে পোধু সোজা হাঁটতে হাঁটতে চার ঘন্টার মধ্যে হাতীগুলো যে অঞ্চলে ছিল সেখানে পেঁছাল। বনের মাঝে এক বিশাল প্রান্তর। সেই প্রান্তরের চারদিকে উঁচু উঁচু গাছ। তার শাখা প্রশাখা ঐ প্রান্তরের আচ্ছাদন তৈরি করেছে। গাছগুলো যেন পাশাপাশি দেওয়ালের কাজ করছে।

ঐ আচ্ছাদনের নিচে যেন কয়েক হাজার হাতী দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাঝে একটা মদ্দ হাতী ছোট একটা পাহাড়ের মত পড়ে ছিল। ওটাই হাতী-

দের রাজা ছিল।

পোধু হাতীর রাজার কাছে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগল।

হাতীর রাজা কী যেন বলল। পোধুর মনে হল হাতীরা যেন তাকে জিজ্ঞেস করছে, "তুমি এখানে কেন এলে?" সাহসে ভর করে মাথা তুলে উচ্চ স্বরে বলল, "হে হাতীগণ, তোমরা যখন আমার ক্ষেতের ফসল নষ্ট করতে গিয়েছিলে তখন আমি তোমাদের প্রতি ভীষণ খারাপ ব্যবহার করেছি। আমি আমার ভাইয়ের বল্লম তোমাদের একজনের শরীর লক্ষ্য করে ছুঁড়েছি! সেই বল্লম ঐ আহত হাতীর সাথে চলে এসেছে। আমার ভাই বলল, ঐ বল্লম তাকে ফেরত না দিলে সে আমাকে মেরে ফেলবে। সেই বল্লম ফেরত নিয়ে যেতে আমি এখানে এসেছি। এখন হয় তোমরা ঐ বল্লম ফেরত দাও নয়তো আমাকে মেরে ফেল! বল্লম না পেলে ওখানে অথবা এখানে মরা আমার কাছে সমান।"

অনেকক্ষণ হাতীগুলো কোন সাড়া শব্দ করল না। তারপর হাতীর রাজা কি যেন ধ্বনি দিল। পরক্ষণে হাতীগুলো কি যেন গুঁ গুঁ করে বলল। তারপর দুটো হাতী পোধুকে নিয়ে গেল দূরের

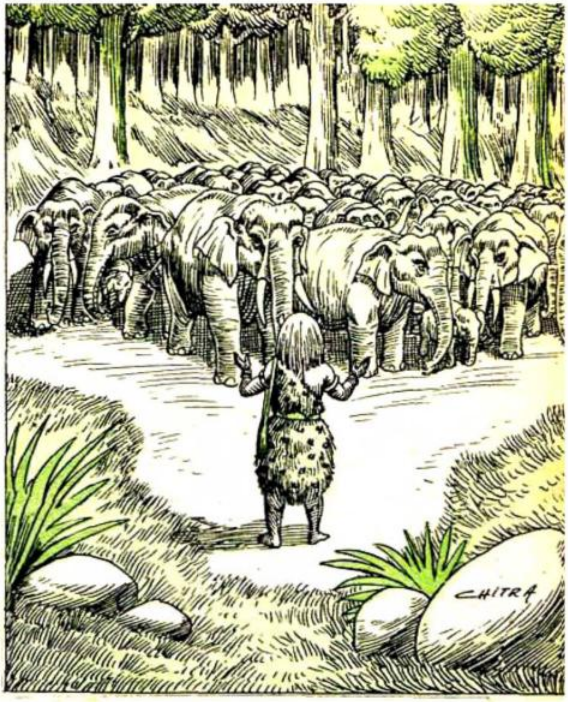

একটা গাছের নিচে।

তারপর হাতীর পঞ্চায়েত বসল। অনেকক্ষণ ধরে ওদের পঞ্চায়েত চললো। মাঝে মাঝে হাতীগুলো কি যেন বলাবলি করে উঠল। অনেকক্ষণ পরে পঞ্চায়েত ভাঙ্গল। পোধুকে ঐ হাতী দুটো আবার রাজার কাছে নিয়ে গেল। হাতীর রাজা আবার কি যেন বলল।

তারপর হাতীগুলো পোধুকে একটা গাছের নিচে নিয়ে গেল। সেখানে অনেকগুলো বল্লম ছিল। পোধু বেছে নিজে যে বল্লমটা ছুঁড়ে ছিল সেটা তুলে নিল। তারপর হাতীদের সামনে গিয়ে মাথা নিচু করে নমস্কার করল। সকৃতজ্ঞ

নমস্কারের পর পোধু বাড়ির পথ ধরল।

ফেরার সময় পোধু হয়ত পথ চিনতে পারল না। সে বুড়ির কুটির খুঁজে পেল না। বুড়ি তাকে যে নীল রঙের পুঁতি দিয়েছিল সেটা তার কাছেই রয়ে গেল। পথ ভুলে হাঁটতে হাঁটতে সে তিন দিনে বাড়ি পৌঁছাল।

নিজের বল্লম ফেরত পেয়ে অরুবা খুব খুশী হল। পোধু নিজের বিচিত্র অনুভূতির কথা সবাইকে জানাল। তার-পর পোধু সবাইকে সেই কাঁচের পুঁতি দেখাল। প্রত্যেকে হাতে করে ঐ পুঁতি দেখল। কেউ অবাক হল। কেউ আনন্দিত হল। এইভাবে দেখতে দেখতে সেই পুঁতি অরুবার বাচ্চা ছেলে মুখে পুরে গিলে ফেলল।

ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐ বাড়ীতে আবার অশান্তি দেখা দিল। পোধুর বউ সেই ছেলেটাকে মারল। ফলে আরুবার বউ দিদির প্রতি কোন রকম সম্মান না দেখিয়ে গালাগাল দিল।

তারপরে, পোধু আরুবাকে বলল, "ভাই, আমি তোমার বল্লম হারালে তুমি আমাকে মেরে ফেলবে বলে ছিলে। আমি জীবন বিপন্ন করে তোমার বল্লম এনে দিয়েছি। এখন তোমার ছেলে যে আমার অত দামী নীল পুঁতি গিলে ফেলেছে। এখন তুমি কি করবে?"

কাল থেকে আমি আলাদা থাকব। কুকুর বিড়ালও মিলেমিশে থাকতে পারে কিন্তু মানুষ পারে না বলে কোন এক বুড়োর কাছে শুনেছিলাম। ঠিক আছে আমি নিজেদের থাকার জন্য আলাদা একটা আস্তানা গড়ে তুলছি।" অরুবা জবাবে বলল।

"তা থাকতে চাও থাক। তবে আমার কাঁচের পুঁতি যে ছেলে গিলেছে সেই ছেলেকে আমায় দিয়ে দাও।" পোধু স্পষ্ট ভাষায় বলল।

আরুবা তাতে রাজী হল। পোধুকে সেই ছেলেকে দিয়ে পরিবার নিয়ে নিজে অন্য জায়গায় চলে গেল।

নহুষ সিংহাসনে বসে ধর্মানুসারে সর্বলোকের আধিপত্য করতে লাগলেন। তিনি প্রথমে ধার্মিক ছিলেন কিন্তু পরে কামপরায়ণ ও বিলাসী হয়ে পড়লেন। একদিন তিনি শচীকে দেখে সভাসদ্‌গণকে বললেন, "ইন্দ্রের মহিষী আমার সেবা করেন না কেন? উনি সত্বর আমার গৃহে আসুন।"

শচী উদ্বিগ্ন হয়ে বৃহস্পতির কাছে গিয়ে বললেন, "আমাকে রক্ষা করুন।"

বৃহস্পতি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "ভয় পেয়ো না, শীঘ্রই তুমি ইন্দ্রের সাথে মিলিত হবে।"

শচী বৃহস্পতির শরণ নিয়েছেন জেনে নহুষ খুব রেগে গেলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ তাঁকে বললেন, "তুমি সংযত হও, পরস্ত্রীসংসর্গের পাপ থেকে নিবৃত্ত হও। তুমি দেবরাজ, ধর্মানুসারে প্রজাপালন কর।"

নহুষ বললেন, "ইন্দ্র যখন অনেক ধর্মবিরুদ্ধ নিষ্ঠুর শঠতাময় কাজ করেছিলেন তখন আপনারা বারণ করেননি কেন? শচী আমার সেবা করলে তাতে তাঁর ও আপনাদের মঙ্গল হবে।"

বৃহস্পতির কাছে গিয়ে দেবতারা বললেন, "কি করলে সকলের মঙ্গল হবে আপনি বলুন।"

বৃহস্পতি বললেন, "ইন্দ্রাণী নহুষের কাছে কিছু দিন সময় প্রার্থনা করুন, তাতে সকলের শুভ হবে। কালক্রমে বহু

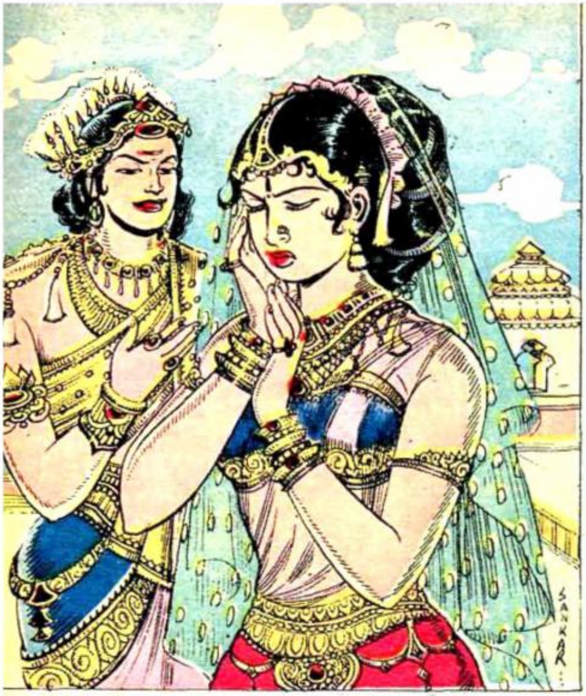

বিঘ্ন ঘটে, নহুষ শক্তিশালী ও গর্বিত হলেও তাঁকে কালসদনে পাঠাবে।"

শচী নহুষের কাছে গেলেন এবং কম্পিত দেহে করজোড়ে বললেন, "সুরেশ্বর, আমাকে কিছুদিন সময় দিন। ইন্দ্র কোথায় কি অবস্থায় আছেন আমি জানি না। সন্ধান করেও যদি তাঁর সংবাদ না পাই তবে নিশ্চয় আপনার সেবা করব।"

নহুষ রাজী হলেন। শচীও বৃহস্পতির কাছে ফিরে গেলেন।

দেবগণ ও বৃহস্পতি প্রভৃতি ঋষিগণ ইন্দ্রের কাছে গিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন। তার ফলে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হলেন। তাঁর পাপ ভাগ হয়ে বৃক্ষ, নদী, পর্বত, ভূমি, স্ত্রী ও প্রাণিগণে সংক্রামিত হল। দেবরাজপদে নহুষকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত দেখে ইন্দ্র পুনরায় আত্মগোপন করে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

শচী পদ্মের নাল ভেদ করে ভিতরে গিয়ে দেখলেন, মৃণালসূত্রের মধ্যে ইন্দ্র অতি সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করছেন। শচী তাঁকে বললেন, "প্রভু, তুমি যদি আমাকে রক্ষা না কর, তবে নহুষ আমাকে বশে আনবে। তুমি নিজ রূপে প্রকাশিত হও এবং নিজের ক্ষমতায় পাপিষ্ঠ নহুষকে বধ করে দেবরাজ্য শাসন কর।"

ইন্দ্র বললেন, "বিক্রম প্রকাশের এখনও সময় আসেনি, নহুষ আমার চেয়ে বলবান, ঋষিরাও হব্য কব্য দিয়ে তার শক্তি বাড়িয়েছেন। তুমি নির্জনে গিয়ে বল,—জগৎপতি, আপনি ঋষিবাহিত যানে আমার কাছে আসুন, তা হলে আমি সানন্দে আপনার সেবা করব।"

শচী নহুষের কাছে গিয়ে এই কথা বললেন। নহুষ বললেন, "বরবর্ণিনী, তুমি অপূর্ব বাহনের কথা বলেছ, আমি তোমার কথা রাখব!"

দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ যখন নহুষকে শিবিকায় বহন করছিলেন, তখন এক সময়ে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে নহুষকে প্রশ্ন

করলেন, "বিজয়ীশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মা যে যজ্ঞে গোবধ সম্বন্ধে মন্ত্র বলেছেন, তা তুমি বিশ্বাসযোগ্য মনে কর কি না।"

নহুষ মোহবশে উত্তর দিলেন, "না, ও মন্ত্র বিশ্বাসযোগ্য নয়।"

ঋষিরা বললেন, "তুমি অধর্মে নিরত তাই ধর্ম বোঝ না। প্রাচীন মহর্ষিগণ এই মন্ত্র বিশ্বাস করেন, আমরাও করি।"

"ঋষিদের সাথে বিবাদ করতে করতে নহুষ তাঁর পা দিয়ে আমার মাথা স্পর্শ করলেন। তখন আমি এই অভিশাপ দিলাম, মূর্খ তুমি ব্রহ্মর্ষিগণের অনুষ্ঠিত কর্মের দোষ দিচ্ছ, পা দিয়ে আমার মস্তক স্পর্শ করেছ, ব্রহ্মার সমতুল্য ঋষি-গণকে বাহন করেছ। তুমি ক্ষীণ পুণ্য হয়ে মহীতলে পতিত হও। সেখানে তুমি মহাকায় সর্প রূপে দু হাজার বছর বিচরণ করবে। তারপর তোমার বংশ-জাত যুধিষ্ঠিরকে দেখলে আবার স্বর্গে আসতে পারবে। শচীপতি, দুরাত্মা নহুষ এইভাবে স্বর্গচ্যুত হয়েছে। এখন তুমি স্বর্গে গিয়ে ত্রিলোক পালন কর। তার-পর ইন্দ্র শচীর সাথে মিলিত হয়ে মহা-নন্দে দেবরাজ্য পালন করতে লাগলেন।"

উপখ্যান শেষ করে শল্য বললেন, "যুধিষ্ঠির, ইন্দ্রের মত তুমিও শত্রু বধ করে রাজ্যলাভ করবে।"

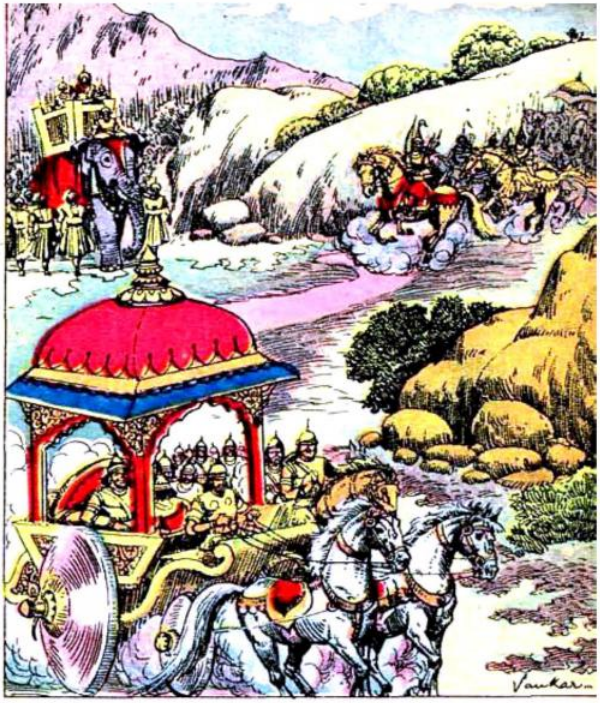

নানা দেশের রাজা বিরাট সৈন্যদল নিয়ে পাণ্ডবদের দলে যোগ দিতে এলেন। ক্ষুদ্র নদী যেমন সাগরে এসে লীন হয়, তেমনি নানা দেশের অক্ষৌহিণী সেনা যুধিষ্ঠিরের বাহিনীতে প্রবেশ করে লীন হতে লাগল। পাণ্ডব পক্ষে সাত অক্ষৌহিণী সেনা সংগৃহীত হল।

দুর্যোধনের দলেও বহু রাজা বৃহৎ সেনাবাহিনী নিয়ে যোগ দিলেন।

দ্রুপদের পুরোহিত হস্তিনাপুরে এলে ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও বিদুর তাঁর সংবর্ধনা করালেন। কুশল জিজ্ঞাসার পর পুরো-হিত বললেন, "আপনারা সকলেই সনাতন রাজধর্ম জানেন। তবুও আমার

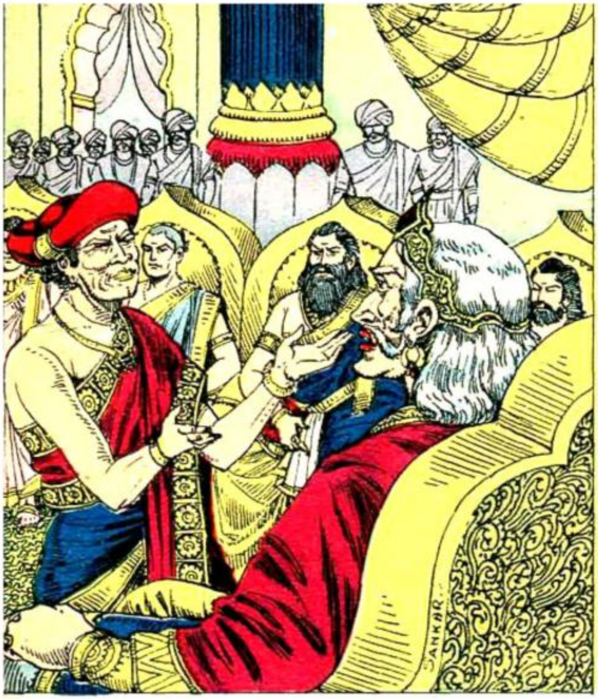

বক্তব্যের অঙ্গরূপে কিছু বলব। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু একজনেরই পুত্র। পৈতৃক ধনে তাঁদের সমান অধিকার। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ তাঁদের পৈতৃক ধন পেলেন, কিন্তু পাণ্ডুর পুত্রগণ পেলেন না কেন? আপনারা জানেন, দুর্যোধন তা অধিকার করে রেখেছেন। তিনি পাণ্ডবগণকে যমালয়ে পাঠাবার অনেক চেষ্টা করেছেন। আপনারা আর বিলম্ব না করে ধর্ম ও নিয়ম অনুসারে যা পাণ্ডবগণের প্রাপ্য তা দিয়ে দিন।"

পুরোহিতের কথা শুনে ভীষ্ম বললেন, "ভাগ্যক্রমে পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণ কুশলে আছেন এবং ধর্ম পথে থেকে সন্ধি কামনা করছেন।"

কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বাধা দিয়ে দ্রুপদের পুরোহিতকে বললেন, "ব্রাহ্মণ, যা হয়ে গেছে তা সকলেই জানে, বার বার সে কথা বলে লাভ কি? দুর্যোধনের জন্যই শকুনি দ্যুত ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে জয় করেছিলেন এবং যুধিষ্ঠির প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য বনে গিয়েছিলেন। অজ্ঞাত বাস উত্তীর্ণ হবার পূর্বেই তিনি মূর্খের মত রাজ্য চাইতে পারেন না।"

ভীষ্ম বললেন, "রাধেয়, বৃথা অহংকার করে কি লাভ হবে। একাকী অর্জুন গোহরণকালে জয় করেছিলেন ছজন রথীকে, তা ভুলে যেয়ো না। এই ব্রাহ্মণ যা বললেন আমরা যদি তা না করি তবে অর্জুনের দ্বারা নিহত হয়ে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে ধূলায় পতিত হব।"

কর্ণকে নিন্দা করে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম যা বলেছেন তা সকলের পক্ষেই মঙ্গলজনক। ব্রাহ্মণ আমি চিন্তা করে পাণ্ডবগণের নিকট সঞ্জয়কে পাঠাব। আপনি আজই অবিলম্বে ফিরে যান।" এই কথা বলে ধৃতরাষ্ট্র দ্রুপদ পুরোহিতকে সসম্মানে বিদায় দিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বললেন, "তুমি উপপ্লব্য নগরে গিয়ে পাণ্ডবগণের সংবাদ

নেবে এবং অজ্ঞাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দন করে বলবে, "ভাগ্যক্রমে তুমি বনবাস থেকে আবার ফিরে এসেছ সকলের মাঝে। সঞ্জয়, আমি পাণ্ডবদের সামান্য এক কণা দোষও দেখতে পাই না। নিষ্ঠুর স্বভাব দুর্বুদ্ধি পরায়ণ দুর্যোধন এবং কর্ণ ভিন্ন তার আর এখানে এমন কেউ নেই যে পাণ্ডবদের প্রতি বিরূপ। ভীম অর্জুন নকুল সহদেব এবং কৃষ্ণ ও সাত্যকি যাঁর অনুগত সেই যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধের পূর্বেই তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। গুপ্তচরদের কাছে কৃষ্ণের যে বীরত্বের কথা শুনেছি তা মনে করে আমি শান্তি পাচ্ছি না। অর্জুন ও কৃষ্ণ মিলিত হয়ে এক রথে আসবেন শুনে আমার বুক কাঁপছে। যুধিষ্ঠির মহাতপস্বী ও ব্রহ্মচর্যশালী, তাঁর ক্রোধকে আমি যত ভয় করি অর্জুন কৃষ্ণকেও তত করি না। সঞ্জয় তুমি রথারোহণে পাঞ্চালরাজের সেনা নিবাসে যাও এবং যুধিষ্ঠির যাতে প্রীত হন সেইভাবে কথা বল। সকলের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করে তাঁকে জানিও যে আমি শান্তিই চাই।"

সঞ্জয় উপপ্লব্য নগরে এসে যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করলেন। উভয় পক্ষের কুশল জিজ্ঞাসার পর সঞ্জয় বললেন,

"মহারাজ, দুর্যোধনের কোন অনিষ্ট করেন নি। তবুও তিনি আপনাদের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত হয়েছেন। স্থবির ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধ সমর্থন করেন না। তিনি মানসিক কষ্ট ভোগ করছেন। সকল পাতক অপেক্ষা মিত্রদোহ গুরুতর—এ কথার ব্রাহ্মণদের কাছে শুনেছেন। অজ্ঞাতশত্রু আপনি নিজের বুদ্ধিবলে শান্তির উপায় ঠিক করুন। সকলেই ইন্দ্রতুল্য, কষ্ট ভোগ করলেও ধর্মত্যাগ করবেন না।" যুধিষ্ঠির বললেন, এখানে সকলেই উপস্থিত আছেন, ধৃতরাষ্ট্র যা বলেছেন তাই বল।"

সঞ্জয় বললেন, "পঞ্চ পাণ্ডব, বাসু-

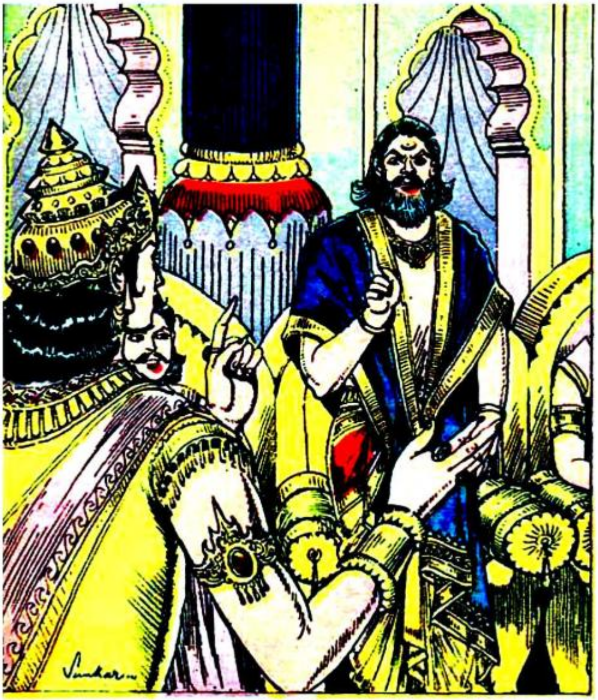

দেব, সাত্যকি চেকিতান, বিরাট পাঞ্চাল-রাজ ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধন করে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। তাঁর কথা আপনাদের মনোমত হোক, শান্তি স্থাপিত হোক। মহাশক্তিশালী পাণ্ডবগণ, নীচ কাজ করা আপনাদের উচিত নয়। শুভ্রবসন অঞ্জনবিন্দুর মত সেই পাপ যেন আপনদের স্পর্শ না করে। কৌরব-গণকে যদি যুদ্ধে বিনষ্ট করেন তাহলে জ্ঞাতিবধের ফলে আপনাদের জীবন মৃত্যুর তুল্য হবে। কৃষ্ণ সাত্যকি ধৃষ্ট্র-দ্যুম্ন ও চেকিতান যাঁদের সহায় কে তাঁদের জয় করবে? আবার দ্রোণ, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, কৃপ, কর্ণ, শল্য প্রভৃতি যাঁদের পক্ষে আছেন সেই কৌরবগণকেই বা কে জয় করতে পারে? জয় বা পরাজয়ে আমি কোন মঙ্গলই দেখছি না। আমি কৃষ্ণ ও বৃদ্ধ পাঞ্চালরাজের নিকট প্রনত হয়ে সকলের মঙ্গলের জন্যই আমি সন্ধির প্রার্থনা করছি। ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রেরও এই ইচ্ছে যে আপনাদের সকলের মধ্যে শান্তি স্থাপন হোক।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "সঞ্জয়, আমি যুদ্ধ করতে চাই এমন কথা বলিনি তোমাকে। তবে ভয় পাচ্ছ কেন? যুদ্ধ না করেই যদি আকাঙ্খিত বিষয় পাওয়া যায় তবে কোন্ মূর্খ যুদ্ধ করতে চায়? বিনা যুদ্ধে অল্প পেয়েও লোকে যথেষ্ট মনে করে। জলন্ত আগুন যেমন ঘৃত পেয়ে তৃপ্ত হয়না, মানুষও সেইরূপ কাম্য বস্তু পেয়েও তৃপ্ত হয়না। ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পুত্রগণ বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করেও তৃপ্ত নয়। ধৃতরাষ্ট্র বিপদে পড়েও অন্যের উপর নির্ভর করছেন। তাতে তাঁর ভাল হবে না। তিনি বহু ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। দুর্বুদ্ধি ও নিষ্ঠুর প্রকৃতি কুমন্ত্রণায় জড়িত পুত্রের জন্য এখন বিলাপ করছেন কেন? দুর্যোধনের স্বভাব জেনেও তিনি বিশ্বস্ত বিদুরের উপদেশ অগ্রাহ্য করে অধর্মের পথে চলেছেন। দুঃশাসন শকুনি আর কর্ণ—এঁরাই লোভী দুর্যোধনের মন্ত্রী।

আমরা বনবাসে গেলে ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পুত্ররা মনে করলেন সমস্ত রাজ্যই তাঁদের হয়ে গেল। এখনও তাঁরাই সমস্ত রাজ্য ভোগ করতে চান। এমন অবস্থায় সম্ভব নয়। ভীম অর্জুন নকুল ও সহদেব জীবিত থাকতে ইন্দ্রও আমাদের ঐশ্বর্য্য হরণ করতে পারবেন না। আমরা কত কষ্ট ভোগ করেছি তা তোমার অজানা নয়। তোমার অনুরোধে সমস্তই ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছি। দুর্যোধন আমাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিন। ইন্দ্রপ্রস্থ আবার আমার রাজ্য হোক।"

সঞ্জয় বললেন, "অজাত শত্রু মানুষের জীবন ক্ষণকালস্থায়ী দুঃখময় ও চাঞ্চল্য পূর্ণ। যুদ্ধ করা আপনার যশের যোগ্য নয়। কাজেই আপনি পাপজনক যুদ্ধ থেকে বিরত থাকুন। বহু বছর বনে বাস করে বিপক্ষের শক্তি বাড়িয়ে এবং নিজের শক্তি ক্ষয় করে এখন যুদ্ধ করতে চাইছেন কেন? আপনার পক্ষে ক্ষমা করাই ভাল, ভোগের ইচ্ছে ভাল নয়। ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন প্রভৃতিকে বধ করে রাজ্য নিয়ে আপনার কি সুখ হবে? যদি আপনার অমাত্যগণই আপনাকে যুদ্ধে উৎসাহ দিয়ে থাকেন, তবে তাঁদের হাতে সর্বস্ব দিয়ে আপনি সরে থাকুন। স্বর্গের পথ থেকে পতিত হবেন না।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "সঞ্জয় আমি ধর্ম কি অধর্ম কাজ করছি তা জেনে আমার নিন্দে করো। বিপদের সময় ধর্মের পরিবর্তন হয়। বিদ্বান লোকে বুদ্ধি বলে কর্তব্য ঠিক করে নেন। আমি পিতৃ-পিতামহের পথেই চলি। যদি সন্ধিতে অসম্মত হই, তবে আমি নিন্দনীয় হব। যুদ্ধের আয়োজন করে যদি ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম পালন না করি তবে আমার দোষ হবে। মহাযশা বাসুদেব উভয় পক্ষেরই মঙ্গলার্থী, তিনিই বলুন আমাদের কর্তব্য।"

কৃষ্ণ বললেন, "আমি দুই পক্ষেরই হিতাকাঙ্খী। শান্তি ছাড়া অন্য কিছু

উপদেশ দিতে চাই না। যুধিষ্ঠির তাঁর শান্তিপ্রিয়তা দেখিয়েছেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পুত্ররা লোভী কাজেই বিবাদের সৃষ্টি হবেই। যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুযায়ী নিজ রাজ্য উদ্ধারের জন্য আগ্রহী হয়েছেন, এতে তাঁর ধর্ম বিনষ্ট হবে কেন? পৈতৃক ক্ষত্রধর্ম অনুসারে যদি যুদ্ধক্ষেত্রে এঁদের মৃত্যু হয় তাও প্রশংসনীয় হবে। সঞ্জয়, তুমিই বল, ক্ষত্রিয় রাজাদের পক্ষে যুদ্ধ করা ধর্মসম্মত কিনা। দস্যু বধ করলে পুণ্য হয়, অধার্মিক কৌরবগণ দস্যুবৃত্তিই অবলম্বন করেছেন। দুর্যোধনের সাথে চোরের কি পার্থক্য আছে? পাণ্ডবগণের শান্তিই কাম্য, যুদ্ধ করতেও সমর্থ, এই বুঝে তুমি ধৃতরাষ্ট্রকে আমাদের মত ঠিক ভাবে জানিও।"

সঞ্জয় বললেন, "মহারাজ, আমাকে এখন যাওয়ার অনুমতি দিন। আমি আবেগে কিছু অন্যায় বলি নি তো? জনার্দন, ভীমার্জুন, নকুল-সহদেব, সাত্যকি, চেকিতান, সকলকেই অভিবাদন করে আমি বিদায় চাইছি।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "সঞ্জয়, তুমি মিষ্ট ভাষী, বিশ্বস্ত দূত, কটু কথায়ও রেগে যাও না। কৌরব ও পাণ্ডবগণ উভয় পক্ষই তোমাকে মধ্যস্থ মনে করেন। তুমি পূর্বে ধনঞ্জয়ের একাত্ম বন্ধু ছিলে। তুমি এখন আসতে পার। ভীষ্মের চরণে আমার প্রণাম জানিয়ে বলো, পিতামহ, যাতে তাঁর সকল পৌত্র প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবিত থাকে তিনি যেন সেই চেষ্টা করেন। দুর্যোধনকে বলো, নরশ্রেষ্ঠ, পরের ধনে যেন লোভ না করে। আমরা শান্তিই চাই, তিনি রাজ্যের একটি প্রদেশ আমাদের দিন। অথবা আমাদের পাঁচ ভাইকে পাঁচটি গ্রাম দিয়ে দিন। যথা কুশস্থল বৃকস্থল মাকন্দী বারণাবত এবং আর একটি। তা হলেই বিবাদের অবসান হবে। সঞ্জয়, আমি সন্ধি অথবা যুদ্ধ এই দুইয়ের জন্য প্রস্তুত। কোমল ও কঠোর দুই ভাবেই সমর্থ।"

শিবপুরাণ

সাত

বিশ্বনাথ এবং বিশালাক্ষী কাশীতে বাস করতে দেখে বেদব্যাসেরও ইচ্ছে জাগল কিছুদিন কাশী বাস করার। এই কথা মনে জাগতেই নিজের শিষ্যদের নিয়ে তিনি কাশী এলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বৈশম্পায়ন, জৈমিনী, পৈল, সুমন্ত, প্রমুখরা ছিলেন।

তাঁরা সবাই প্রাতঃরাশ সেরে গঙ্গায় স্নান করে আহ্নিক সেরে গায়ত্রী জপ করলেন শিবের অর্চনা করে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত শিবপুরাণ পাঠ করলেন। তারপর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে এক এক জন এক এক দিকে বেরিয়ে পড়লেন।

তখন বিশ্বেশ্বর বিশালাক্ষীকে বললেন, "আমি ব্যাসের মন পরীক্ষা করে দেখব। ওকে যাতে কেউ ভিক্ষা না দেয় তার ব্যবস্থা কর।"

বিশালাক্ষী তাতে রাজী হলেন। কাশী নগরের প্রত্যেক গৃহিণীর মনে ভিক্ষা না দেবার চিন্তা ঢুকিয়ে দিলেন।

ব্যাস "ভিক্ষাং দেহি" বলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। বিশালাক্ষীর ইচ্ছানুসারে প্রত্যেক বাড়ির গৃহিণীরা বলতে লাগল, "এখনও রান্না হয়নি। ঘুরে এসো।" কয়েক বাড়ির গৃহিণী দরজাই খোলেনি।

ব্যাসের ব্যাপারে যা ঘটল অন্যের ব্যাপারেও তাই হল। সারা দিন ধরে গোটা শহরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। শেষে নিরাশ হয়ে খিদের জ্বালায় ক্লান্ত হয়ে ফিরে এলেন।

"আমি তো একটা দানাও পাইনি। তোমারা পেয়েছ না কি?" ব্যাস নিজের শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন। শিষ্যরা

শেষ প্রচ্ছদ চিত্র

জানাল যে তারাও ভিক্ষা পায়নি।

"জানি না আজ সকালে আমি কার মুখ দেখেছি।" ব্যাস বললেন।

টানা সাতদিন ধরে একই অবস্থা। ব্যাস ভেবেই পেলেন না কি করে এ-সম্ভব। যে কাশী নগরে দিবোদাস শাসন করছেন, যে কাশী নগরে বিশ্বনাথ বর্তমান, যে নগরের প্রত্যেক গৃহিণীই অন্নপূর্ণা নামে অভিহিত সেই নগরে তাঁকে উপবাসে কাটাতে হচ্ছে। উপবাসের ফলে বৈশম্পায়ন, সুমন্ত, পৈল, জৈমিনী, দেবল, আর দাল্‌ভ্যু ক্লান্ত হয়ে দুর্বল হয়ে অজ্ঞান হতে চলেছেন।

আট দিন হতে চলল। প্রত্যেকে যথারীতি দৈনন্দিন কার্যসূচী অনুযায়ী সমস্ত দেবতাকে প্রণাম করলেন। তারপর ব্যাস এবং তাঁর শিষ্য ভিক্ষা করতে বেরুলেন।

ব্যাস একটি বাড়ি থেকেও ভিক্ষে পেলেন না। তাঁর সীমাহীন রাগ হল। তিনি ঠিক করলেন ভিক্ষা পাত্র পাথরের উপর আছড়ে মেরে ভেঙ্গে ফেলবেন। কমণ্ডলুর জল হাতে নিয়ে ভাবছেন কাশীবাসীদের অভিশাপ দেবেন। তারা যেন তিন পুরুষ ধরে বিদ্যা, ধন এবং ভক্তি থেকে বঞ্চিত হয়। জল হাতে তুললেন কিন্তু হাত নাবাতে পারলেন না। হাত নাবল না।

ঠিক সেই মুহূর্তে পঞ্চাশ বছরের এক গৃহিণী বাড়ির দরজা খুললেন। তাঁর গা ভর্তি অলঙ্কার। বললেন, "হে ব্রাহ্মণ, অভিশাপ দিয়ো না। আমার কাছে এসো।"

ব্যাস অত্যন্ত খুশী হয়ে তাঁর কি বর্ণ, কি পরিচয় না জেনেই তাঁকে প্রণাম করলেন। ব্যাস তাঁর কাছে যেতেই তিনি বললেন, "ভিক্ষে পাওনি বলে কাশী নগর বাসীদের অভিশাপ দিচ্ছ? তোমার মনের শুদ্ধির পরিচয় পেতে বিশ্বেশ্বর এই রকম করেছেন। তা না হলে কাশী নগরে তোমার খাবারের অভাব পড়ত? তুমি কি শোন নি যে দুপুরে অতিথিদের

সময় মত অন্নপূর্ণা সোনার পাত্রে অমৃত তুল্য ক্ষীর এনে খাওয়ান। মাত্র সাত দিন খেতে না পেয়ে তুমি এতটা রেগে গেলে যে গোটা কাশীনগর বাসীকে অভিশাপ দিচ্ছ ? জান কাশীনগরী হোল শিবের দ্বিতীয় পত্নীর মত। তুমি প্রমাণ করে দিলে যে ক্ষুধা মানুষকে কতখানি অমানুষ করে দিতে পারে। পাপ কাজ করতেও তার বাধে না। এসো আমি তোমাকে ভিক্ষে দিচ্ছি।"

একথা শুনে ব্যাস বললেন, "মা, কতদিন পরে আমি এমন মধুর কথা শুনতে পেলাম। আপনার ভিক্ষা গ্রহণ করতে আমি একা আসব না, আমার শিষ্যদের নিয়ে আসব ? সবাই তো ক্ষুধার্ত। মা তুমি যা চাও, দাও। আমরা সবাই ভাগ করে খাব।"

ব্যাসের মুখ থেকে একথা শুনে সেই মহিলা হেসে উঠে বললেন, "বাবা, মধ্যাহ্নের পূজাপাঠ গঙ্গাতীরে সেরে তোমরা সবাই চলে এস। সবাইকে পেট ভরে খাওয়াব।"

তারপর ব্যাস নিজের তিনশো শিষ্য-সহ গঙ্গার তীরে গেলেন। দুপুরের পূজো শেষ করে ব্যাস ঐ মহিলার বাড়ি এলেন। তাদের সবাইকে ঐ বৃদ্ধা ভোজন-শালায় পিঁড়িতে বসিয়ে সবার সামনে

কলাপাতা পাতলেন।

বৃদ্ধা ওদের মধ্যে বিভূতি বন্টন করে সবার মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, "বাবারা, এবার তোমরা সবাই গণ্ডুষ করে পরম তৃপ্তির সাথে খাও।"

এই সব দেখে ব্যাস এবং তাঁর শিষ্যরা একে অন্যের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগলেন। পাতায় কোন খাবার পরিবেশিত হয়নি। এমন কি রান্নার কোন গন্ধও পাওয়া যাচ্ছিল না। অথচ পরম তৃপ্তির সাথে খেতে বলছেন!

সবাই ভাবল, বৃদ্ধা কি কাণ্ডই না করছেন। আজও উপোষে কাটবে।

এমন সময় কয়েকজন মহিলা

গণ্ডুষ করার জন্য জল এনে দিল।

"বাবা, অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর দেরি করো না। খাওয়া শুরু কর। গণ্ডুষ করে নাও।" বৃদ্ধা বললেন।

তখন সমস্ত অতিথিরা গণ্ডুষ করে নিজের পাতার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যান। পাতায় পাতায় অপূর্ব মিষ্টান্ন পরিবেশিত। যে যা খাওয়া পছন্দ করে তার পাতে তাই পরিবেশিত ছিল।

সবাই বুঝতে পারল যে এই বৃদ্ধা সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ছাড়া আর কেউ নন।

খাবার পর বৃদ্ধা ব্যাস এবং তাঁর শিষ্যদের বিশ্রাম করার আয়োজন করলেন।

কিছুক্ষণ পরে বিশ্বনাথ পার্বতীকে নিয়ে ব্যাস প্রমুখদের বিশ্রামের জায়গায় এলেন। পার্বতীর চোখে মুখে প্রশান্তির ছাপ। কিন্তু শিবের চোখে মুখে ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

শিব-পার্বতীকে দেখে সবাই প্রণাম করে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে পড়েন।

শিব পার্বতীকে নিয়ে একটা উঁচু জায়গায় বসে ব্যাসের দিকে ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "ওরে দুষ্ট, মহাভারতের মূর্খ লেখক, তোমার এত অহঙ্কার হয়ে গেছে যে কাশী আমার দ্বিতীয় পত্নীর মত, তাকেই তুমি অভিশাপ দিতে গিয়েছিলে! তোমার এই নগরে ঢোকাই অপরাধ হয়েছে! এক্ষুণি তুমি তোমাদের শিষ্যদের নিয়ে সোজা কাশী ছেড়ে চলে যাও।"

ব্যাস শিব এবং পার্বতীর পায়ে প্রণাম করে শিষ্যদের নিয়ে কাশী ছেড়ে চলে যেতে তৈরি হলেন।

এই অবস্থা দেখে পার্বতী আর থাকতে পারলেন না। বললেন, "বাবা তুমি চিন্তা করো না। তুমি আর কোথাও যেয়ো না। দক্ষারামে গিয়ে ভীমেশ্বরের উপাসনা কর। তোমার মঙ্গল হবে।"

পার্বতীর পরামর্শ অনুসারে ব্যাস নিজের শিষ্যদের নিয়ে ভীমেশ্বরের অর্চনা করতে দক্ষারামে চলে গেলেন।

৭/'শত বর্ষের বৃক্ষ'

ক্যারাবিয়ান সাগরে পোর্টোরিকোর পূবদিকে অবস্থিত 'ভার্জিন' দ্বীপ আমেরিকার অধিবাসী-দের এক বিশেষ ভ্রমণ স্থান। ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে কলম্বাস এই দ্বীপগুলোর দেখা পেলেন। ১৯১৭ তে এই অঞ্চল আমেরিকার অধীনে এল। এখানে মোট তিনটে মনোরম দ্বীপ আছে। এদের নাম সেন্ট টমস, সেন্ট জোন, সেন্ট ক্রায়। এখানকার অধিকাংশ নিবাসী নিগ্রো। ভ্রমণ-কারীদের উপর নির্ভর করেই তাদের জীবন চলে। এই দ্বীপগুলোর জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ।

এই দ্বীপগুলোর বিচিত্র দৃশ্যের একটি হল 'শতবর্ষের বৃক্ষ'। এর পাতাগুলো মোটা মোটা। কথিত আছে যে এই গাছে একশো বছরে একবার ফুল ফোটে। এই কারণেই এই গাছের নাম 'শত বর্ষের বৃক্ষ' হল। এই গাছের ফুলের রং হয় হলুদ। আর ফুলগুলো হয় গোছা গোছা। ফুলের আয়ু পাঁচ বছর। কিন্তু ফুল ফোটার সাথে সাথে গাছ মৃত্যুর দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়।

ফটো : পি. বালাজীরাও

পুরস্কৃত
টীকা

গরিব বোনের সোহাগ

পুরস্কার পেলেন
প্রকৃতি ভদ্র

ফটো : বালাজীরাও

মোহিনী নিবাস, অঞ্জনগড়,
শ্যামনগর, ২৪ পরগণা

বানরেরও আছে অনুরাগ

পুরস্কৃত
টীকা

ফটো-নামকরণ টীকা প্রতিযোগিতা ঃঃ পুরস্কার ২০ টাকা

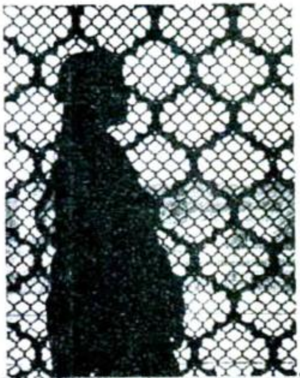

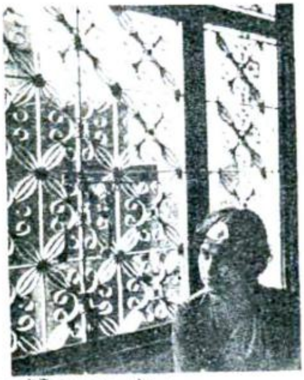

★ ফটো-নামকরণ ২০শে ফেব্রুয়ারী '৭৩-এর মধ্যে পৌঁছানো চাই।

★ ফটোর নামকরণ দু চারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর নামকরণের মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই। নিচের ঠিকানায় পোস্ট-কার্ডেই লিখে পাঠাতে হবে। পুরস্কৃত নাম সহ বড় ফটো এপ্রিল '৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

★ সফল প্রতিযোগীর ঠিকানায় কুড়ি টাকা পাঠানো হবে।

চাঁদমামা

এই সংখ্যার কয়েকটি গল্প-সম্ভার

হারানো আংটি	... 2	এক দিনের রাজা—পাঁচ	... 29
যক্ষপর্বত	... 9	সোনার পাখি	... 39
রাক্ষস-বিবাহ	... 17	হাতীর পঞ্চায়েত	... 43
তিন মূর্খের গল্প	... 21	মহাভারত	... 49
স্থান কাল পাত্র	... 22	শিবপুরাণ	... 57
কথার দাম	... 25	বিশ্বের বিস্ময়	... 61

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

তৃতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

বেলুনের বাহার

Printed by B. V. REDDI at The Prasad Process Private Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for Chandamama Publications, 2 & 3, Arcot Road, Madras-26. Controlling Editor: CHAKRAPANI

EVERY LIBRARY SHOULD POSSESS!

★

'SONS OF PANDU'

Rs. 5-25

'THE NECTAR OF THE GODS'

Rs. 4-00

In English by : Mrs. Mathuram Bhoothalingam

CHILDREN'S BOOKS: WORTHY FOR PRESENTATION OR PRESERVATION

★

Order today:

DOLTON AGENCIES

'CHANDAMAMA BUILDINGS'

MADRAS-26

সোয়ান কলমই

মহাকাশ—অভিযান-যুগের ছাত্রদের উপযোগী কলম

TRADE MARK

সোয়ান (ইণ্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ

আলকানি চেম্বার্স, ফিরোজ শা মেহতা রোড, বোম্বাই—১

শাখা : ৩৪-বি কনট প্লেস নিউ দিল্লী—১

heros'-SI-120 Ben

গ্রাহক হবার জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ ডল্টন এজেন্সী, চাঁদমামা বিল্ডিং, মাদ্রাজ-২৬

Photo by: MADAN GOPAL

CHANDAMAMA (Bengali) FEBRUARY 1973 Regd. No. M. 9100

শিবপুরাণ